স্বসংবেদন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

সুসংবেদন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

পশ্যন্তী প্রকাশনী
কলিকাতা-৩

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ্ স্ট্রীট
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, ১

মূল্য ৬·০০ মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

৩। জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

নিবেদন

'স্বসংবেদন' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই ইহার পূর্ব বা পরবর্তী অংশ কেন প্রকাশ করা হইল না বা কবে প্রকাশ করা হইবে, এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহসহকারে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। পূজনীয় আচার্যদেবের বার্ধক্য-জনিত অসামর্থ্যের দরুণ তাঁহার এই সব লেখার ক্রমিক পৌর্বাপর্য অনুসারে সংগ্রহ বা উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত শ্রীজগদীশ্বর পাল মহাশয় 'স্বসংবেদনে'র আর একটি খাতা কাশীধাম হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া তাহা প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হই, কারণ এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে পৌর্বাপর্য বা বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার তত মূল্য নাই, যতটা অসামান্য মূল্য আছে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে পূজনীয় আচার্য-দেবের ভাস্বর হৃদয়াকাশে যখন যে তত্ত্বটি প্রোজ্জ্বল তারকার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অভিনব আলোক-বিচ্ছুরণে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, একটি তত্ত্ব হয় তো তাঁহার হৃদয়াকাশে পর পর কয়দিন ধরিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে কিংবা তাহারই সহিত সম্বন্ধ আর একটি তত্ত্ব তাহার পাশেই বা তাহার পরই জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব একবার উদিত হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পরে পুনরায় নব আলোকে আসিয়া উদিত হইয়াছে। যেমন, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রসঙ্গ (পৃঃ ২০, ২৬, ৫৬) বিভিন্ন তারিখে, কখনও বা মাসাবধি কালের ব্যবধানে তাঁহার অন্তর্জ্যোতির আলোক-পটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগুলি একত্র করিয়া সাজাইয়া দিলে পাঠকের পক্ষে হয় তো সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা সেরূপ সম্পাদনা-কর্ম হইতে বর্তমানে বিরত থাকিয়াছি। লেখাগুলি ডায়েরী আকারের বলিয়া পর পর তারিখ অনুসারে যেমন লিপিবদ্ধ আছে, তেমন-ভাবেই প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই আপন আপন প্রয়োজনমত নানা স্থানে উল্লিখিত বা বিভিন্ন দিনে লিপিবদ্ধ করা বিষয়গুলিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া বা সাজাইয়া লইবেন। আমরাও 'স্বসংবেদন' পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হইয়া গেলে আলোচিত বিষয়সমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইব।

আর একটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূজনীয় আচার্যদেব অনেক সময় তত্ত্বগুলিকে পরিস্ফুট করার জন্য কোনো যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া 'ক' 'খ' ইত্যাদি সংকেতক্রমে তত্ত্বটি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপ অনেকগুলি যন্ত্র অঙ্কন করা এবং তদুপরি ব্লক করিয়া ছাপান বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে আমাদের সীমিত সাধ্যের বাহিরে বলিয়া একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথম দিকে যে দুই একটি যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ছাপান হইয়াছে, তাহা শ্রীমতী দীপ্তি পাল স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। যেখানে 'ক' 'খ' ইত্যাদির উল্লেখ আছে অথচ পাশে কোনো যন্ত্র ছাপা নাই, সেখানে পাঠকের বুঝিতে খুব অসুবিধা হইবে না, তবে একটু কল্পনাশক্তির আশ্রয় লইতে হইবে।

এই জাতীয় রচনার কী বৈশিষ্ট্য, তাহা আমরা পূর্ব খণ্ডের ভূমিকায় সামান্য-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পূজনীয় আচার্যদেবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই বিচ্ছিন্ন তিন স্তর ব্যাপিয়াই অবিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানগঙ্গার নির্মল ধারা প্রবাহিত। তাই কোথাও আমরা দেখি, তিনি উল্লেখ করিয়াছেনঃ 'কাল রাত্রে স্বপ্নে পাইলাম' (পৃঃ ৫); কোথাও বা লিখিয়াছেন, অন্য কাহাকেও 'বুঝাইবার সময় প্রত্যক্ষ হইল' (পৃঃ ৭০)। পাতঞ্জল দর্শনে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন বলা হইয়াছেঃ 'নির্বিচারবৈশারদ্যে অধ্যাত্মপ্রসাদঃ'। এই স্ফুট প্রজ্ঞালোকের স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহই আমরা পূজনীয় আচার্যদেবের দিব্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ এই ডায়েরী হইতেই আমরা প্রমাণ পাই যে এই আশ্চর্য প্রজ্ঞালোক তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী জীবনের প্রারম্ভ হইতেই সহজ সংবেদনের আকারে বা 'স্বজ্ঞা'রূপে তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই আমরা ইহার কিছু অংশ প্রকাশিত করিতে পারিলাম এবং সেই অধ্যাত্মপ্রসাদের অমৃত-আস্বাদনে নিজেরা ধন্য হইলাম, ইহার জন্য সেই 'নিজবোধ-রূপা কাশিকা'র অধিষ্ঠাতা বিশ্বনাথের চরণে আমাদের কৃতজ্ঞ' প্রণতি নিবেদন করি।

আজকালকার নানা বাধা-প্রতিবন্ধের মধ্যে টেম্পল্ প্রেসের কর্মীরা আন্তরিক সহযোগিতা না করিলে এত দ্রুত ও যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে এই গ্রন্থ ছাপান সম্ভব হইত না। এজন্য তাঁহাদের একান্ত ধন্যবাদ জানাই।

বর্ধমান
উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি
১৩৮১ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

৪/১/১৯২৫

দেবতাকে ডাকিলেই তাঁকে আসন, পাদ্যাদি, ভোজ্যাদি দিতে হয়। অন্ততঃ মানস। দেবতা যখন অব্যক্ত, তখন কিছুই চাই না। কিন্তু অভিব্যক্ত হইলেই সব চাই। জাগিলেই তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—আমার প্রার্থনা শোনেন, বা জবাব দেন—জাগিলে।

ডাকার দুইটী তাৎপর্য। প্রথমতঃ ইহা সম্বোধন,—বা জাগরণ, অব্যক্তের ব্যক্তীকরণ। দ্বিতীয়তঃ ইহা আভিমুখ্য সম্পাদন। তারপর কথাবার্ত্তা=ভাববিনিময়।

তবে সত্ত্ব একেবারে বিশুদ্ধ হইলে দেবতার নিদ্রা আর নাই বা নিজেরও নাই। একই কথা। একেবারে বিশুদ্ধ হইলে তাই আর জাগাইতে বা ডাকিতে হয় না। সর্বদাই জাগাই আছে। কেবল প্রয়োগ করা বা না করা—তা স্বেচ্ছাধীন।

জ্যোতিও বাহিরের—যখন প্রকাশমান। যখন অব্যক্ত, তখন যথার্থ আত্মতত্ত্বে স্থিতি। অব্যক্ত জ্যোতি অপ্রকাশ—ওখানে শিব ও শক্তি একই। জ্যোতি বাহির হইয়াই সত্ত্বে পড়ে—তখন প্রকাশমান হয়। সত্ত্বে আসিয়া পড়িলেই প্রকাশমান জ্যোতি, আকার বৈচিত্র্য ইত্যাদি সকল হয়।

ভিতর হইতেই জ্যোতি বাহির হয়, তখন দেখা যায় না, অর্থাৎ তখন উহা শক্তি হইলেও জ্যোতিরূপ, রা প্রকাশরূপ নয়। সত্ত্বে পড়িলেই জ্যোতি ভাবে ফোটে।

বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরেট। তার প্রভা বিকীর্ণ হয় না। যেমন searchlight, সর্বদাই একাগ্র, সংহত, জমাট-বাঁধা—ছড়াইয়া পড়ে না। সত্ত্বে বাহিরের সীমাই রজোবলয়। ওখানে জ্যোতির আভাস কণসমষ্টি। সেখান হইতে আভাস বা রশ্মি বিকীর্ণ হয়—ক্রমশঃ তমোবলয়। সেখানে গভীর আঁধার। মধ্যে মিশ্রণ।

৭/১/২৫

মানুষমাত্রই দেবতা। সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্বে সেও ষোড়শবর্ষীয় বা তদন্তঃস্থ। উহা স্বাভাবিক দেহ। বৃদ্ধও যখন জগদম্বার দর্শন পাইয়া তাঁহার কোলে নিজেকে দেখিতে পাইবে সেও শিশু হইয়া, ৫।৭ বৎসরের হইয়া মার কোলে আছে।

১০/১/২৫

কাহারও চিত্তে সংস্কার-রূপে কি আছে না আছে দেখিতে হইলে ব্রহ্মতেজঃ সেই চিত্তে ফেলা দরকার—অবশ্য খুব অল্প; ইহাই ঈক্ষণ, সমসূত্রে দর্শন। করিলেই চিত্ত তোলপাড় করিবে, সুপ্ত বৃত্তি বা সংস্কার জাগিয়া উঠিবে। কারণ ব্রহ্মতেজের স্বভাবই এই যে জাগাইয়া দেওয়া ও জাগাইয়া বিনাশ করা। তখন সব ক্রমশঃ surfaceএ উঠিবে। যদি দীর্ঘকাল এই প্রকারে ঈক্ষণ করা যায়, তবে উহা উঠিবে ও বিনষ্ট হইবে। ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে। পরে একটু তীব্রভাবে তেজঃ সঞ্চার করিলেই চিত্ত ভাঙিয়া যাইবে—মনোনিবৃত্তি হইয়া যাইবে। কেননা, সব মন যাইয়াও শেষে একটা পর্দা থাকে—সেটি অবিদ্যা। চিত্ত প্রাকৃতভাবে শুদ্ধ হইলেও সেটি থাকে। ব্রহ্মতেজের একটু তীব্রভাবের সঞ্চারে উহা নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিত্তও যায়। কারণ, অবিদ্যা গেলে চিত্ত থাকিতে পারে না। একমাত্র চৈতন্যই থাকে।

এ অবস্থায় ঈক্ষণে সংস্কারের উদ্বোধন হইবে—বিনাশের জন্য। আর যদি শুদ্ধসত্ত্বে পুটিত করিয়া ঈক্ষণ করা যায় তাহা হইলে সংস্কারকে উপরে —surface বা thresholdএ উঠিতে হয় না, দৃষ্টিই নীচে নামিয়া সব দেখিয়া লয়। সংস্কার সাক্ষাৎকৃত হয়। যার সংস্কার সে কিন্তু জানিতেও পারে না। কারণ, সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া বৃত্তি না হইলে সে বুঝিবে না।

দীক্ষার দৃষ্টির সঙ্গে ইহার তফাৎ আছে। দীক্ষা—ব্রহ্মদীক্ষাই হউক বা শক্তিদীক্ষাই হউক—চৈতন্য বা শুদ্ধ সত্ত্বের অংশ করিয়া নিতে হয়। ইহা রজোবলে। পরে ঐ অংশ সঞ্চার করিতে হয়—তমঃর উপর। অর্থাৎ রজঃকে অবলম্বন না করিলে দীক্ষা দেওয়া চলে না; কারণ, তমঃকে বিনাশ করা যাবে না।

চিৎশক্তির দীক্ষাতে চিত্তের প্রভাবে তিনটি গুণই আলাদা হইতে থাকে। শেষে কিছুই থাকে না। চৈতন্যই মাত্র থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের দীক্ষাতে তমঃ সরিয়া যায়। সত্ত্বাংশ শুদ্ধসত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া জমিয়া যায়—যখন সব জমিয়া যায়, তখন চিত্ত নির্মল অথচ অটুট, চৈতন্যের ধারণক্ষম।

বিন্দু দেশকালের অতীত,—নিত্য। সৃষ্টিকালে উহা হইতে রেখার বিকাশ হয়। ইহা এক মাত্রা-dimension, ইহার সন্নিবেশই যন্ত্র, চক্র প্রভৃতি হইয়া থাকে। মূলধাম সম-ত্রিকোণ। ইহা কারণ-শরীর। ইহার পর লিঙ্গদেহ। ইহা সমতল—দুই dimension. যেমন পট বা ছবি—দৃশ্য বটে, ছায়ার মতন, কিন্তু ঘনত্ব নাই। লিঙ্গদেহ যেন দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব। বিম্ব স্থূল, প্রতিবিম্ব

লিঙ্গ, বিম্ব তিন dimension, প্রতিবিম্ব দুই dimension. আর স্থূলদেহ ঘন, cube তিন dimension, যেমন মূর্ত্তি বা প্রতিমা।

যন্ত্রই দেবতাদের কারণ-দেহ। যার ধ্যান দেখি তা লিঙ্গ ও স্থূলের। দেবগণ কারণ-জগতের বলিয়া কারণ-দেহই তাঁদের একমাত্র স্বাভাবিক দেহ। কারণ-দেহ মহাকারণে বা সমষ্টিতে লীন হয়—ইহা সম-ত্রিকোণ বা সমচতুরস্র বা বৃত্ত। ইহা নিত্য। তবে সঙ্কোচে বিন্দুভাবপ্রাপ্ত, প্রসারে ত্রিকোণাদি রূপ।

বিন্দু এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক। যেন চণক।

১১/১/২৫

দেবতা জাগিলেই খাদ্য চান, না পাইলে আবার ঘুমাইয়া পড়েন। খাদ্য, আহার্য, জীবন-ধারণের অবলম্বন—একই কথা। ভালবাসা, পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদি সবই দেবতার ভোগ্য বা খাদ্য। যেমন অগ্নির খাদ্য কাষ্ঠ। আলম্বন বা বিষয়ই খাদ্য। ইহাই আধার। নিরাধার দেবতা বা চৈতন্য অব্যক্ত—তার উপাসনা নাই, কেননা তার আহারের আবশ্যকতা নাই ; সে নিষ্ক্রিয়। যার নাম সত্তাসংরক্ষণ, তারই নাম ক্রিয়া-সম্পাদন। ইহা করিতে হইলে আধার বা আহার বা বিষয় চাই-ই।

সত্ত্বের সত্তা তন্মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণসাপেক্ষ। চৈতন্যের স্ফুরণ সংঘর্ষ ও আহার—অর্থাৎ রজোতমঃ-সম্বন্ধসাপেক্ষ। যখন রজোতমঃর সম্বন্ধ থাকে না, তখন সত্ত্ব চৈতন্যকে ধারণ করিতে পারে না—কারণ, চৈতন্যের খাদ্যের অভাব হইয়া পড়ে। ব্যক্ত চৈতন্য আহার চায়—রজঃ-তমঃ-মনই তার আহার বা বিষয়। ব্যক্ত চৈতন্য আহার সমাধা করিয়াই অব্যক্ত হয় বা ঘুমাইয়া পড়ে। সত্ত্ব আর সৎ থাকে না—অসৎকল্প হইয়া যায়। অর্থাৎ মূলা প্রকৃতিতে সত্ত্ব অব্যক্ত হয় —যেখানে রজঃ-তমঃ-সম্বন্ধ নাই।

আমি চাই সত্ত্ব ব্যক্ত থাকে, অথচ রজঃ-তমঃ তাতে না থাকে। অব্যক্ত সত্ত্ব চৈতন্যকে ধারণ করে না বলিয়া অসৎকল্প,—তাহা সত্ত্বপদবাচ্য নহে, যদিও তার সঙ্গে রজঃ ও তমঃর মিশ্রণ না থাকুক। ব্যক্ত সত্ত্ব চৈতন্যকে ধারণ করে বটে, কিন্তু সে চৈতন্যের আহাররূপে রজঃ-তমঃকে সঙ্গে মিশ্রিতভাবে রাখে, তাই তাহা অনিত্য ও হেয়। প্রথমটি জড়-সমাধি—আমি তা' চাই না, তাতে জ্ঞান নাই। দ্বিতীয়টি বৃত্তিজ্ঞান ; সবিষয়ক—তাও চাই না। তাতে জ্ঞান আছে কিন্তু তাহা সান্ত ও সবিষয়ক বলিয়া দুঃখ আছে। সুখও আছে বটে, তা দুঃখসম্ভিন্ন।

আমি চাই

(১) চৈতন্যময় দুঃখনিবৃত্তি। ইহা তখন সম্ভব যখন শুদ্ধসত্ত্ব পাব, যাতে মল নাই। এই সত্ত্ব স্থির ও নির্মল।

(২) আনন্দ বা অনুকূল বোধ। ইহা তখন সম্ভবে যখন ঐ শুদ্ধসত্ত্বে প্রবাহ হবে, অথচ তাহা আত্মমুখী। অবশ্য মল নাই বলিয়া বিষয়-সম্বন্ধ নাই—সুতরাং বৈরাগ্য ত' সিদ্ধই। প্রবাহ হলে তাহা আত্মসুখের হবে। সুতরাং তাহা অনুকূল। উহা চৈতন্যেরই প্রবাহ—নাম, আনন্দ।

আর একটি কথা। অব্যক্ত ও ব্যক্ত চৈতন্য কি? অব্যক্ত চৈতন্য=শিব। ব্যক্ত চৈতন্য=শক্তি। একটি বিন্দু, অপরটি রেখা। বিন্দু হ'তে রেখার প্রসার, সঙ্কোচে রেখা বিন্দুরূপে পরিণত। রেখা প্রসারিত হয়ে শুদ্ধসত্ত্বে পতিত,—তাতে সত্ত্ব 'সৎ'। ঐ রেখা যদি বিন্দুতে যাইয়া লয় হয়, তা হলে শুদ্ধসত্ত্বও অসৎকল্প, কিন্তু স্থির ; কারণ প্রবাহ আবার আসিলে তাতেই ধৃত হবে।

কিন্তু যখন বিন্দু হইতে সত্ত্বে, সত্ত্ব হইতে বিন্দুতে প্রবাহ অনবরত ঘুরিতে থাকে—কোথাও রেখার অভাব থাকে না, তখন শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধ বশতঃ চৈতন্য ব্যক্তই থাকে। এ অবস্থায় শুদ্ধসত্ত্ব হইতে নিরন্তর প্রবাহ চলে বলিয়া নিত্যানন্দ লাভ হয়। কিন্তু বিন্দু হইতে যে প্রবাহ সত্ত্বে পড়ে, তাহা যদি নিরন্তর না হয়, তবে সত্ত্ব হইতে ঐ প্রবাহ বিন্দুতে ফিরিবার সময় যে আনন্দ হয়, সে আনন্দ বাড়িতে বাড়িতে বিন্দুতে বিলীন হইবার পূর্বে ব্রহ্মানন্দের বা পূর্ণানন্দের আস্বাদন হয়। পরে প্রবাহ বা রেখা বিন্দুতে বিলীন হইলে আর আনন্দ থাকে না। তখন সত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বলিয়া শক্তিও রেখাত্মক নহে, অব্যক্ত। এক বিন্দুই থাকে—তাই শিবতত্ত্ব। তাকে বিন্দু নামও তখন দেওয়া চলে না। (বিন্দু = সাক্ষী)

কিন্তু বিন্দু হইতে প্রবাহ নিরন্তর হইলে, সত্ত্ব হইতেও প্রবাহ নিরন্তর হবে। ফলে নিত্যচক্রের আবির্ভাব। ইহাকেই লীলারস বলে। মনে রাখিতে হইবে যে, বিন্দু হইতে সত্ত্বে পড়িবার সময় শক্তি রেখাত্মিকা হইলেও অব্যক্ত। কিন্তু সত্ত্বে পড়িলে উহা ব্যক্ত হয় ; তখন উহা চৈতন্যপদবাচ্য। আবার ফিরিবার সময় উহা রেখাত্মিকা হয়, কিন্তু দবার উহা স্বয়ংপ্রকাশ, ব্যক্ত—ইহা অন্তঃপ্রবাহশীল চৈতন্য বা আনন্দ—যার পরাকাষ্ঠা বিন্দুতে বিলয়ের প্রাক্কালে। বিলয়ান্তে সৎ, চিৎ, আনন্দ—তিনই অব্যক্ত। তাহাই পূর্ণত্ব। যাকে বলেছি সত্ত্ব—তাহাও বিন্দু। তাহা সদাশিব, বিদ্যা, ঈশ্বর—ত্রিবিধ। শিব=মহাবিন্দু। এই সত্ত্ব বা সদাশিবই আসন—প্রেতাসন, যখন শুদ্ধসত্ত্ব হতে চৈতন্য ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট হয়ে যাবে বিপরীত স্রোতে—তাই শক্তি গিয়ে শিবে পড়বে : তাই ইহা বিপরীত রতাসক্ত শক্তি।

১২/১/১৯২৫

কাল রাত্রে স্বপ্নে পাইলামঃ—

বিন্দু হ'তে রেখা হয়। বিন্দুতে বিন্দুতে কখনই সংযোগ হয় না। হইলেই একপ্রকার একই হইয়া যাইবে,—সাযুজ্য। রেখা আর কিছুই নহে—দুইটি বিন্দুর যে প্রভামণ্ডল তন্মধ্যস্থ কোন একটি রশ্মির সহিত অপর বিন্দুর কোন একটি রশ্মির আকর্ষণ। যে প্রবল, সে টানে—রশ্মিদ্বারা টানে, অপর রশ্মিকে টানে। তখন প্রবল পক্ষেও একাগ্রতা, দুর্বল পক্ষেও তাই। প্রবলের অন্যান্য রশ্মি ঐ রশ্মিতে সমবেত হয়, দুর্বলেরও তাই হয়। ফলে রশ্মি যাহা অসংহত বেলায় অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হইয়া রেখা আকার ধারণ করিল। ইহা নৈয়ায়িকের দ্ব্যণুকজাতীয়। বস্তুতঃ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হয় না। এক বিন্দুর প্রভারাজ্য হ'তে যদি তার টান অপেক্ষা প্রবল টানে অপর বিন্দুকে সরান যায়, তাহা হইলে উভয় বিন্দুই অব্যক্ত—কারণ রশ্মি অসংহত বলিয়া অব্যক্ত। বিন্দু অব্যক্ত নিখিল শক্তি। রেখা নিখিল শক্তির একরূপে সমষ্টি-ভাবে প্রাকট্য। সুতরাং এক রেখা-সমন্বিত বিন্দু সর্বশক্তিমান্—অবশ্য একটি বিশিষ্ট শক্তিপূর্ণ, তাতে যাবতীয় শক্তি বিলীন। তাকে বিশিষ্ট শক্তি বলা শুধু নীচের অনুরোধে। বৈশিষ্ট্যসত্ত্বেও তা সামান্য। রাম বল, আর শ্যাম বল—যে আকারই ধর, তাহাই পূর্ণ, তদিতরাকারের বিলয়-স্থান। ইঁনিই সাকার মহাশক্তি। শুধু বিন্দু নিরাকার মহাশক্তি। কারণ রেখা অপ্রকট।

এই যে রেখা ইহা শুধু বিন্দুদ্বয় মাত্র নহে—তজ্জন্য অভিনব বস্তু। তাই ইহাও এক। তাই ইহারও—রেখারূপে নহে, প্রকট বিন্দুরূপে—প্রভামণ্ডল আছে, চারিদিকে রশ্মি আছে। এ রশ্মিসকল রেখাত্মক প্রকট রশ্মি হইতে বিলক্ষণ। এখন পূর্বনিয়মে আবার আকর্ষণ প্রভৃতি হয়।

এই যে প্রবল দুর্বলকে টানিয়া রাখে—এই টান যদি না থাকে, তবেই সং-যোগ থাকিল না, দ্ব্যণুকাদি থাকিল না। টান=ইচ্ছা। ইহাকে ভাঙ্গা যায় জ্ঞানের দ্বারা। তাই জ্ঞানের বিকাশে এই টান কমিতে কমিতে নষ্ট হয়, আরও বিকাশে সবই জ্ঞানময় দেখায়, আরও বিকাশে দেহপাত হয়। তারপরে বিদে-হাবস্থা। তখন আর বিকাশ ওরূপ দাহকভাবে সম্ভবে না। কারণ, দেহ বা মন সম্বন্ধ নাই। তখন জ্ঞান তাপহীন। আরও বিকাশে ভক্তির উদয়—নবরাজ্যে প্রবেশ, যেন চন্দ্রিকাস্নাত ধাম।

যদি বিশ্ব আমার দেহ হয়, তবে আমার জ্ঞানে সে দেহ বিনষ্ট হবে—প্রলয় হবে। নতুবা নহে।

১৫/১/২৫

ষোড়শবর্ষ পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি। তাই তখন বালকও বালিকাবৎই থাকে —গোঁফ্-দাড়ি থাকে না, ইত্যাদি।

ষোড়শবর্ষ = পূর্ণ প্রকৃতি বা পূর্ণ পুরুষ, উভয়ই বিশুদ্ধ, নিত্য মিলিত।

তারপর উভয়ই মলিন। মলিনতার কারণ কি? পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিতে থাকে। পুরুষও মলিন, প্রকৃতির মধ্যেও মলিনতা আছে। তাই বিকার হতে থাকে।

নিত্যাবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য ষোড়শবর্ষীয়। প্রকৃতি সদা নির্বিকার, তাই সদা ষোড়শী। পুরুষও তাই। বস্তুত সাক্ষীই পুরুষ। কিন্তু সাক্ষী ভোগ করে না, লীলা করে না। তাই পুরুষরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতিই আবির্ভূত হন। সুতরাং পুরুষও বাস্তবিক প্রকৃতিই। যাহাকে আমরা পুরুষ বলি, তাহা প্রকৃতি হ'তেই আবির্ভূত। খেলাবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে। সাক্ষী অবশ্য সদাই আছেন।

তা হ'লে দাঁড়াল এই—

দুইটি স্তর—

১। সাক্ষী—প্রকৃতি। এটা একই বস্তু। তবে বুঝিবার জন্য দুই। ইনি সপ্তদশী। মহা ত্রিপুরসুন্দরী। "আদ্যা ললিতা"। আদ্যা।

[কালী]

২। পুরুষ (১৬ বর্ষীয়) ও প্রকৃতি (১৬ বর্ষীয়া) (=ষোড়শী)—এই পুরুষ প্রকৃতি [ষোড়শী] হতেই আবির্ভূত। নিত্য মিথুন, নিত্য মিলিত। বিকার নাই। (১) ও (২) র মধ্যে আর একটা স্তর আছে মনে হয়। সেটা সরস্বতী। বোধ হয়—সেটাই তারার। (২) র উপরে আর জ্যোতি নাই। তমঃ—শুদ্ধতমঃ—বা অব্যক্ত। অলোক।

১৬/১/২৫

বিশুদ্ধসত্ত্ব হ'তে আত্মার দিকে যে প্রবাহ অথবা আজ্ঞাচক্র হ'তে সহস্রারের দিকে যে প্রবাহ, তাহাকে আনন্দ বলে। আজ্ঞা হইতে বিষয়ের দিকে যে প্রবাহ তাকে দুঃখ বা সংসার বলে। প্রবাহ-রহিত আজ্ঞা হ'তে সহস্রার বা সহস্রার-মণ্ডল শুদ্ধচৈতন্য। এই আনন্দই সুধা, সুরা, অমৃত ইত্যাদি।

১৭/১/২৫

আয়নার মধ্যে যা কিছু দেখা যায়—তাহা সূক্ষ্ম। তন্মধ্যস্থ space বা আকাশ—হৃদয়াকাশ। স্বচ্ছ জিনিষ মাত্রই তাই।

তা সূক্ষ্ম—তার স্থূল নাই তা প্রতিবিম্ব—বিম্ব নহে। তার বিম্ব নাই।

যদি ঐ স্বচ্ছ পদার্থটি একেবারে শুদ্ধ ও solid হয়, তা হ'লে ওতে প্রতিবিম্ব পড়িতে পড়িতে সৃষ্টি বিম্ব হয়ে যায়, স্থূল হয়—সৃষ্টি হয়।

ঐ স্বচ্ছ পদার্থটি ধারণ-পাত্র। কি ধারণ করিবে? আকার। উহার সম্মুখে যাহা আসিবে—আত্মা হ'তে, তাহাই স্থূল হইবে।

আত্মা → O সত্ত্ব (শুদ্ধ)

প্রাকৃত সত্ত্বে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মানস সৃষ্টি বা জীবসৃষ্টি—প্রাতিভাসিক সৎ।

শুদ্ধসত্ত্বে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা বাহ্য স্থূল সৃষ্টি,—ব্যবহারিক। ঈশ্বর-সৃষ্টি।

শুদ্ধসত্ত্ব নিরাকার ও সাকার। অনন্ত আকার তাতে নিহিত আছে। এই আকার জাগিলেই তাকে ভাবের উন্মেষ বলে। ইহাতে বিকার নাই। তাই ইহা সাংসিদ্ধিকভাব বা স্বভাব।

প্রাকৃত সত্ত্বে বিকারগ্রস্ত ভাব ও আকার, কারণ মনসম্বন্ধ হয়।

১৮/১/২৫

সূক্ষ্মদেহ দুই প্রকার—

(১) আলোহীন ছায়াময়, বিম্বহীন প্রতিবিম্ব। ছায়া আছে—কায়া নাই। অর্থাৎ ছায়া = কায়া। ছায়াতে আলো মগ্ন, এক হ'য়ে আছে।

(২) ছায়াহীন আলোময়। আলো = কায়া। ছায়া তাতে মগ্ন আছে। উভয়েরই shadow নাই।

শুদ্ধ অন্ধকারে বা শুদ্ধ আলোকে দুইয়ের একটিও প্রকাশমান হয় না। স্থূলের ছায়া পৃথকভাবে, অথচ সংলগ্ন হইয়া ভিত্তিতে পতিত হয়।

জ্ঞানশক্তি + ক্রিয়াশক্তি = পূর্ণশক্তি॥ [স্বয়ং ভগবান্ মহা-শক্তি, পরশিব, পূর্ণব্রহ্ম]

অপূর্ণশক্তি (each) | শুদ্ধজ্ঞানশক্তি—শিব, ভগবান্, ব্রহ্ম
| শুদ্ধক্রিয়াশক্তি—শিবানী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী।

পূর্ণ অবস্থায় prediction নাই—যাহা বলা, তাহাই হবে। স্বাতন্ত্র্যবশতঃ।

জীবভাব কিঞ্চিৎ থাকিলে ভেদাভেদ। যখন যা বলা যাবে, তাহা সাক্ষাৎকৃত বলিয়া কালচক্রে আসিয়া ঠিকই হবে। তবে না হ'তেও পারে। হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯, না হওয়ার সম্ভাবনা ১। জগতে যাহা কিছু আছে তাহার উপরি হ'তে যখন দেখা গেছে তখন তাহা না হওয়ার হেতু একমাত্র পূর্ণের স্বাতন্ত্র্য—আর কিছু নাই। এটাও নীতির কথা। কার্যকারণভাবের কথা। মহাশক্তি

নীতির বা নিয়তির ঊর্ধ্বে—স্বতন্ত্র। তাই তাঁর ইচ্ছা (=নীতি) তিনিই রদ্ করিতে পারেন। অন্যে পারে না। অন্যে নীতিরূপ তাঁর ইচ্ছাটি জানিতে পারে মাত্র। ভগবান্‌ও তাই। সে ইচ্ছা—জগতে প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই Law, Causality। স্বাতন্ত্র্যে কোন নিয়ম নাই।

ব্রহ্মসূত্র ৪/৪/ মুক্ত পুরুষ এই প্রকার ভেদাভেদময়। "অবিভাগ" বলা হ'য়েছে, 'সম্পত্তির পর আবির্ভাবশীল', বলা হয়েছে। পূর্ণের সহিত অভেদ বা সাম্য আছে—ভোগে, জ্ঞানে, সচ্চিদানন্দ অনুভবে, কিন্তু জগদ্ব্যাপারবর্জ বলিয়া সিদ্ধবস্তুর অন্যথাকরণে অনধিকারী। ঘটকে পট করিতে পারেন, কিন্তু মূলপ্রকৃতিরূপ চরম উপাদানকে পরস্পর পরিবর্তন বা বিনাশ করিতে পারেন না। উহাই পরমাণু। উহাকে ভগবান্ বা মুক্ত আত্মা বদ্‌লাতে বা বিনষ্ট করিতে অসমর্থ। নিজে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে পারেন—কিন্তু পূর্বসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বা গতির মূল বদ্‌লাতে পারেন না। ক্রিয়াংশে পারেন। মূল পূর্ণসাপেক্ষ। এই অংশে ভেদ।

ভেদাভেদে সাম্য ও ভেদ দুইই রহিল। ভেদাংশে দুই আছে—সে স্থলে, পূর্ণ হ'তে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ন্যূন। সমান হ'লে ত' সাম্য বা অভেদই হ'ল। কাজেই মুক্তাত্মার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ ভেদ থাকাকালে পূর্ণের ইচ্ছা অপেক্ষা দুর্বল। তাই পূর্ণ ইচ্ছায় যে কাজ হয়, তার গতি রোধ করিতে পারে না। চাহিলেও পারে না। এটা আসুর ভাব। আর দৈবভাবে ত' চাহিবেই না। পারিবে না তা জানা থাকে—তাই চাহিবে না। আর যদি মুক্তাত্মা পূর্ণের সহিত সমান বা এক হয়—তবে ত' ইচ্ছা একই। সে ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিজের ইচ্ছা নিবৃত্ত হবে ; অথবা নিবৃত্ত করতে ইচ্ছা হবেই না।

মুক্তাত্মায় জ্ঞানের আনন্ত্য আছে। ক্রিয়াশক্তির আনন্ত্য নাই। শুদ্ধসত্ত্ব ধরিয়া চলিলে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ থাকিবে—কিন্তু পূর্ণ স্ফূর্তি থাকিবে না। এক্ষেত্রে তাই জ্ঞান ও ক্রিয়া পৃথক্।

যখন জ্ঞান ও ক্রিয়া সমরস, পৃথক্ নহে—তখন পূর্ণশক্তির বিকাশ বা পারমৈশ্বর্য। তাই মহাশক্তি। সেখানে যাহা বলা, তাহা স্বাতন্ত্র্যবশতঃ হবেই।

তাই ব্রহ্মসূত্রের মুক্তিও পূর্ণমুক্তি নহে।

চেষ্টা না করিলেও মহাপ্রলয়ের সময়ে সকলেরই মুক্তি হবেই। অবশ্য পূর্বেও হ'তে পারে। কিন্তু শুদ্ধধামে যাওয়ার কোন নিয়ামক নাই। ইহা শুধু তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। চেষ্টা করিলে যা পাওয়া যায় তা স্বর্গ। চেষ্টা বস্তুতঃ ছাড়িলে যা পাওয়া যায় তা স্বরূপ বা মুক্তি। আর ভগবানের রাজ্যে যাওয়া চেষ্টা বা কর্মদ্বারা হয় না ; চেষ্টা ছাড়া বা জ্ঞানদ্বারা হয় না। হয় ভক্তিতে—তা কর্মসাধ্য নয়, জ্ঞানসাধ্যও নয়। তাঁর কৃপাই মূল। ভক্তিধাম

মহাপ্রলয়ের ঊর্ধ্বে স্থিত। মোক্ষধাম মহাপ্রলয়ের আদিতে ও অন্তে স্থিত। স্বর্গ তার নীচে।

কালচক্রের কেন্দ্রে মোক্ষ বা স্বরূপ। চক্রের মধ্যে স্বর্গ (ইত্যাদি), কাল-চক্রের অতীত বা কেন্দ্রের অন্তরে ভক্তি। মোক্ষ = তুরীয়। ভক্তি = তুর্য্যাতীত।

২১/১/২৫

কাল পাওয়া গিয়াছিল—

কামকলা কি? আত্মা—তাহা = মুখের expression. বিশেষতঃ চোখের expression—চাহনী দ্বারা ব্যঙ্গ। ইহাই প্রকৃত দেহ। ইহার বিলাসই লীলা।

আজ—

মূলতত্ত্বগুলিই কারণ-বারি। তার সমষ্টিই কারণসমুদ্র। এই মূলতত্ত্বগুলি মূলাপ্রকৃতির অঙ্গস্বরূপ পরমবস্তুর অণু বা টুকরা বলিয়া পরমাণু পদবাচ্য। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ ব্রহ্মাদিরও অসাধ্য। এই পরমাপ্রকৃতি যখন নিষ্কম্প থাকেন তখন অঙ্গ ও অঙ্গী একাকার—উভয়ই অব্যক্ত। কম্পনের ফলে পৃথক্ ভাবের আভাস আসে। কম্পন ঈক্ষণমূলক। ব্রহ্মাদি ঐ পৃথগ্‌ভূত উপাদান-রাশির সমষ্টি করেন মাত্র, বা বিভক্ত করেন।

কারণ-বারির অধিষ্ঠাতারূপে আছেন যিনি, তিনি নারায়ণ বা নারায়ণী। এই কারণ-বারি যাঁহা হ'তে উদ্ভূত, তিনি নর।

প্রতি দেহের অন্তর্যামী যিনি, তিনিও পরমাত্মা। তিনি জ্ঞানশক্তিমান্—চৈত্যগুরু। তিনি চালক—দয়াবান্ হইলেও সংস্কারকে অপেক্ষা করিয়া সঞ্চালন করেন। সেইপ্রকার প্রেরক। কৃতকর্মকে বা নিয়তিকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তিনি সর্বজ্ঞ হ'লেও পূর্ণশক্তিমান্ নহেন। অংশমাত্র। ইনিই ব্যষ্টি-কুণ্ডলিনী। গর্ভোদশায়ী।

সমষ্টি কুণ্ডলিনী=সমষ্টি অন্তর্য্যামী বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা ব্রহ্মার অন্তর্যামী। তিনি ক্ষীরোদশায়ী।

যিনি সমগ্র জগতের অন্তর্যামী, তিনি কারণার্ণবশায়ী।

এই তিনপ্রকার পরমাত্মা। পরমাত্মায় পূর্ণশক্তি প্রকট নহে। ইনিই গুরু। ইনিই সদাশিব। জ্ঞানশক্তির মূর্তি। তদধীন ক্রিয়ার চালক বটে। জ্ঞান ও ক্রিয়া সমান হইলে উভয়ই পূর্ণ হয়, কিছুই থাকে না। তখন পূর্ণশক্তি জাগে। তিনিই বাসুদেব বা পরমাত্মা।

যজ্ঞোপবীত ত' সুষুম্না-প্রবাহ (ব্রহ্মতেজের) নাগ=কুণ্ডলিনী। তাহা যখন চলে, তখন নাগযজ্ঞোপবীত।

২৪/১/২৫

বীজ, অঙ্কুর, বিকাশ—ষোড়শে।

কোরক, পুষ্প—ষোড়শে।

১৬ বৎসরে পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাহাই নবযৌবন। ১৫ পর্যন্ত কৈশোর। পূর্বাবস্থা ক্রমবিকাশ। সত্ত্বের বিকাশ।

তার পরে কীটের দংশন, মনস্পর্শ ইত্যাদি। ফলে জরা ও মৃত্যু।

পূর্ব হ'তেই অল্প-বিস্তর কীটের ক্রিয়া থাকে। কাহারও বা বেশী থাকে। সে কিশোরাবস্থার পূর্বেই জরাজীর্ণ

দেবগণ অজর ও অমর।

২৭/১/২৫

অকালমৃত্যু আছে কিনা? কালমৃত্যুই বা কি?

মৃত্যুর বীজ সঙ্গেই আছে, জরাও আছে। প্রকাশকালের মাত্র অপেক্ষা। যখন স্বভাবের নিয়মে প্রকাশকাল আসিবে, তখন মৃত্যু বা জরা হইবেই। তবে যদি বাহির হইতে সজাতীয় পরমাণু অনুপ্রবিষ্ট করিয়া তাহার প্রাকট্য সম্পাদন করা যায় বা উক্ত অনুপ্রবেশে তাহার প্রাকট্য হয়, তাহা হইলে যখন হইবে, তখনই জরা হইবে—মৃত্যুও হইবে। ইহা অকালমৃত্যু বা অকালজরা।

বালকাবস্থায় যদি মৃত্যু হয়—আর যদি সে মৃত্যু কালমৃত্যু হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার জরাবীজ বিশেষ ছিল না। এই সব বালক দেব-লোক হইতে সমাগত বুঝিতে হইবে। Those whom gods love, die young. ইহার তাৎপর্য ইহাই। কালমৃত্যু—অকালমৃত্যু বুঝা কঠিন।

আবার এমনও হইতে পারে—মৃত্যুর বীজকে প্রকাশকাল পাইতে দেওয়া হইতেছে না, অথচ জরার বীজ প্রকাশকাল পাইতেছে। এমন অবস্থায় অতি দীর্ঘজীবন—সহস্রাদি বর্ষ—লাভ হইবে, কিন্তু দেহ জীর্ণ হইবে। তবে যদি জরার বীজও স্তব্ধ রাখা যায়, তবে দেহ জীর্ণ হইবে না, অথচ আয়ু বৃদ্ধি হইবে।

জরা যদি অকালে হইতে পারে, তারুণ্যও পারে, অর্থাৎ জরাজীর্ণকেও তরুণ করা যায়। সেইরূপ মৃতকেও বাঁচান যায়।

(মদন ও বসন্তের সখ্য ও সম্বন্ধ আলোচ্য)

২৮/১/২৫

শ্রীপঞ্চমী।

শ্রী=লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য বা সৌন্দর্য।

শ্রী=সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান। শ্রীপঞ্চমী। অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ একাধারে। শ্রীপঞ্চমীকে বসন্ত-পঞ্চমীও বলে। এই সময় হইতেই বসন্ত ঋতুর সূচনা। সুতরাং কামের সহিত সম্বন্ধ। অতএব এ শ্রী=শ্রীবিদ্যাও বটে, বা কামেশ্বরী। শ্রীবিদ্যাও পঞ্চমী নামে প্রসিদ্ধ।

মহাশক্তি মধ্যস্থা—দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। মুক্তি ও সিদ্ধি তাহা হইতেই জন্মে। গণেশ সিদ্ধি ও পূর্ণতা, স্কন্দ=ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মতেজঃ, কুমার।

দুর্গা (মহাশক্তি) × শিব
সরস্বতী × ব্রহ্মা (জ্ঞান)
লক্ষ্মী × বিষ্ণু (ঐশ্বর্য)

২৯/১/২৫

সম্পূর্ণভাবে পুরুষকার ত্যাগ হইলেই সাধনা গেল। তখন আর পৌরুষ নাই—পুরুষত্ব বা পুংস্ত্ব নাই। সেটা নপুংসকভাব। এক হিসাবে সেটা প্রকৃতি-ভাবাপত্তি। ইহারই importance. স্বভাব-চালিত অবস্থা—বাতাহত তৃণের ন্যায় অবস্থা। তখন আমিত্ব থাকে না। মহাশক্তি কৃপা করিয়া তাঁর অধীন হন। তখন মহাশক্তি তাঁকে পরমপুরুষরূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং তাঁহার আদেশবর্তিনী শক্তি হইয়া নিত্যসঙ্গিনী হন। ইহাই পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী।

মহাশক্তিই পুরুষকে পুরুষোত্তমে পরিণত করেন। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ পুরুষ নিঃশক্তিক।

অতএব অবস্থা—

(১) পুরুষের পৌরুষ-ত্যাগ। ফলে নিষ্ক্রিয়ত্ব—'অহং'বিনাশ, ক্লীবত্ব, আশ্রিতত্ব। এটা শক্তিরহিত ভাব।

(২) তারপর মহাশক্তির আবির্ভাব—ফলে ক্লীব ব্রহ্ম পরমপুরুষে পরিণত। ইহাই পূর্ণাহন্তা। এটা সর্বশক্তিযুক্ত অবস্থা। নিত্য মিলিত রূপ।

যাহাদের ভিতর জিনিস আছে, তাহাদের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া—বিশেষতঃ ধর্ম বিষয়ের আলোচনা অবৈধ। কারণ ঐগুলি উদ্দীপন। উদ্দীপনে অন্তস্থ বস্তু জাগিয়া উঠে। তখন তাতে প্রবাহ ছোটে। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার বা বিন্দুসিদ্ধির পূর্বে সাধারণ প্রবাহ বহির্মুখ বলিয়া ঐ বস্তুও বাহিরের দিকে ছুটিয়া যায়। তাতে ক্ষতি হয়। অবশ্য অন্য সন্নিহিত লোকের তাতে লাভই হয়।

বিন্দুসিদ্ধির পর উদ্দীপনে উপকার হয়। কারণ, তাতে বিন্দুর ঊর্ধ্বগতি হয়—ভগবৎশক্তির সঞ্চার হয়। কাজেই অন্যের নিকটে ভগবদ্বিষয়ে আলোচনা

বিন্দুসিদ্ধি বা সংযম লাভের পূর্বে কর্তব্য নহে। এইজন্য ক্রিয়াদিও অন্যের সমক্ষে কর্তব্য নহে। ভোজনও তাই।

৩০/১/২৫

প্রকৃতি দ্বিবিধ—

(১) ব্যক্ত প্রকৃতি=বিশুদ্ধসত্ত্ব। ঈশ্বর।

(২) অব্যক্ত প্রকৃতি=গুণসাম্য। ব্রহ্ম।

স্বপ্ন বৈকারিক হলে মিলে না, প্রাকৃতিক স্বপ্ন সত্ত্বহেতুক।

দেবমূর্ত্তিও বৈকারিক আছে—তাহা চিত্তের বিকার মাত্র। তাহা মিশ্র-সাত্ত্বিক—প্রতিবিম্ব, subjective, আবার প্রাকৃতিক আছে—তাহা শুদ্ধসত্ত্বময়, সুতরাং চিত্তবিকার নহে, objective নহে।

মলিনসত্ত্বই বিকার। বৈষম্য ভিন্ন সত্ত্বে মন লাগিতে পারে না—বৈষম্য বিকার। শুদ্ধসত্ত্ব বিকার নহে। তাহা প্রকৃতি।

৩১/১/২৫

শুদ্ধস্তরের দেবতারা সকলেই একাগ্রভূমিতে আছেন। নিজে একাগ্র হইলেই তাই তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়। একাগ্রভূমির নিয়মই এই যে, একটা বস্তু সদা লেগে থাকা। বাহ্য ব্যাপার করতে হ'লেও, বহুদিকে যেতে হ'লেও একটিতে লেগে থাকার হানি হয় না। লেগে থাকা হ'য়েই থাকে—তবে একাংশে অন্য কাজ চলে। সে কাজ হ'য়ে যাবামাত্রই ঐ অংশ আবার আপনিই ফিরে যায়।

ঈশ্বর স্বয়ং একাগ্রভূমিতে আছেন—নিরোধের দিকে লেগে আছেন। দেব-দেবী সব ঈশ্বরে লেগে আছেন।

তাই ঈশ্বর একাধারে মহাযোগীও বটেন। আবার যোগগম্য নিরোধ বা গুণাতীতও বটেন। নিজেই নিজের ধ্যানে মগ্ন আছেন।

তাই পটে, ঘটে একাগ্র হ'তে পারিলেই হ'ল। দেবতা ত' একাগ্র আছেনই—সেই অগ্রে যে আকার লাগান যাবে, তদাকারে প্রকাশমান হবেন।

যা বাড়ে, যার বিকাশ হবে—তা পূর্ণ নয়। যার পরে আর অবস্থা নাই, যার বৃদ্ধি নাই, তা পূর্ণ। যার সবটুকু প্রকাশকালকে পেয়েছে, তার কিছুই অব্যক্ত নাই, সে-ই পূর্ণ।

কিন্তু একটা কথা আছে;—এতাদৃশ পূর্ণতা দ্বিবিধ।

১। যার হ্রাস নাই, জরা নাই, বিকার নাই।

২। যার ক্রমাদি আছে।

জগতে দ্বিতীয় প্রকার পূর্ণতা আছে। যেমন পূর্ণিমা—আর বৃদ্ধি নাই বটে; সব কলার প্রকাশ বটে। কিন্তু হ্রাসাদি আছে ত'।

মায়াতীত পূর্ণিমায় যেমন বৃদ্ধি নাই, তেমনই হ্রাসাদিও নাই। তাই তাহা চিরকাল সমভাবাপন্ন, একভাবাপন্ন—বাড়েও না, কমেও না।

১/২/২৫

জপ করিলে বীজ উঠে মূলাধার হ'তে, চৈতন্য নামে সহস্রার হতে। সহস্রার চিরব্যক্ত, চিরপ্রকাশ ও প্রকাশক। মূলাধার অব্যক্ত। বীজ উঠে—ক্রমে কূটস্থে উভয়ের সম্মিলন হয়। সেখানে দর্শন হয়। যার কূটস্থ খুলে গেছে, তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে, অন্ততঃ একটি মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে—তার ত' সুষুম্না-পথ মুক্ত হয়ে গেছে। সে যে কোন দেবতার দর্শন পেতে পারে, যদি সে দেবতার বীজ জপ করে। অবশ্য সে বীজ গুরুদত্ত হওয়া আবশ্যক। তবে একবার যদি ব্রহ্মবীজ গুরুর নিকট হ'তে পাওয়া যায়, তবে অন্য বীজ আর গুরুমুখ হতে পাওয়ার দরকার হয় না। গ্রন্থ হ'তে বীজ গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে। নতুবা প্রতি দেবতার বীজই গুরুদত্ত হওয়া আবশ্যক।

উচ্চারণ মানে বীজ উপরে চালিত হওয়া। বীজের সঙ্গে গুরুশক্তির সহকারিতা না হইলে বীজ উপরে উঠিবে না। বীজের উপরে উঠাই চক্রভেদ—অঙ্কুরাদিক্রমে বিকাশ বা ষট্‌চক্রভেদে কূটস্থে তাহার প্রকাশ। অব্যক্ত স্তর হ'তে বীজকে ফোটান বা অভিব্যক্ত করাই ষট্‌চক্রভেদ বা মন্ত্রসিদ্ধি বা দেব-দর্শন ইত্যাদি। ব্রহ্মতেজই অব্যক্তকে ব্যক্ত করে। তাই ব্রহ্মতেজের সহায়তা চাই।

ব্রহ্মতেজঃ latentকে patent করে। শুধু latent শক্তি কার্যক্ষম নহে। তাহাকে কার্যকরী করিতে হইলে তার সঙ্গে patent শক্তির সংযোগ আবশ্যক। যেমন, একখানা ছোট প্রস্তর—তাতে অবশ্যই শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু তাহার ক্রিয়া বুঝিতে হইলে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আপন শক্তি উহার সহিত যোগে উহাকে জাগাইয়া উভয়ে মিশিয়া কার্যকারক হয়। কেবল জাগানই তাহার কাজ নহে। কারণ ঐ প্রস্তর যদি একজন ৫ বর্ষ বালক আমাকে মারে, আর যদি একজন বলিষ্ঠ প্রৌঢ় মারে —আঘাতের তারতম্য হইবে। প্রস্তরই আঘাতের হেতু বটে। তথাপি তাহাকে প্রৌঢ় প্রয়োগ করিলে তার বেগ বেশী হইবে; কারণ প্রৌঢ়ের বল অধিক। প্রৌঢ়ের জাগ্রৎ শক্তি প্রস্তরের সুপ্তশক্তিকে জাগাইয়া উভয়ে মিলিয়া প্রযুক্ত হয়। কাজেই বুঝিতে হইবে—একই মন্ত্র যদি অধিক শক্তিশালী গুরুর নিকট হ'তে আসে, তবে তার বীর্য অধিক হবে, কম শক্তিশালী গুরু হ'লে মন্ত্রের

বীর্যও কম হবে। যদি গুরুতে জাগ্রৎ শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ত' সে গুরু paralysed—তিনি মন্ত্রের প্রয়োগ করিতেই পারিবেন না। মন্ত্র মূলাধারে আছে, মূলাধারেই থাকিবে। নিদ্রিতই রহিল। ধাক্কা পাইল না।

আর একটি কথা। একই গুরু একই পরিমাণ শক্তি যদি দুইটি মন্ত্রে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলেও দুই মন্ত্রের বীর্য সমান হবে না, যদি উভয়-মন্ত্রের নিহিত শক্তিতে তারতম্য থাকে। ৫ সের বস্তুর আঘাত, আর ৫ ছটাক বস্তুর আঘাত সমান হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য—৫ ছটাক জাগাতে যে শক্তি আবশ্যক, ৫ সের জাগাতে তার চেয়ে বেশী আবশ্যক। যিনি ৫ ছটাক জাগাতে বা নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি যে ৫ সের পারিবেন, তাহা বলা যায় না। যিনি ৫ সের পারিবেন, তিনি ৫ মণ না পারিতেও পারেন। কিন্তু যিনি ৫ মণ পারেন, তিনি ৫ ছটাক বা ৫ সের পারিবেন। কাজেই প্রকৃত গুরু তিনি, যিনি সর্বাপেক্ষা ভারী জিনিস উঠাইতে পারেন। সর্বাপেক্ষা ভারী জিনিস প্রণব—ব্রহ্মবীজ। যিনি প্রণবকে জাগাইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মমন্ত্রকে উঠাইয়াছেন ও উঠাইবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহার পক্ষে অন্য বীজ বা মন্ত্র অতি হাল্কা—তাহা উঠান বা প্রয়োগ করা অতি সহজ।

ব্রহ্মজ্ঞানকে উঠান মানে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। তাই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হ'লে জগদ্‌গুরু হয়।

৫/২/২৫

সাকার হ'তে নিরাকার, নিরাকার হ'তে সাকার—অনেকে বলে। বোধ হয় ঠিক নয়। সাকারও নিরাকারে মিশে আছে। সমভাব থাকলে তাহাই পূর্ণ-ভাব—যাহা উভয়ের অতীত। সাকার না হ'য়ে সাকারকে চালান যায় না। আবার সাকারের অতীত না হ'লেও হয় না। কাজেই সাকারের অতীত যে সাকার, তাহা নিরাকার-সঙ্গে একাকার। তেমনি নিরাকার না হ'য়ে নিরাকার ধরা যায় না, জানা যায় না। কাজেই এমন সাকার আছে, যাহা = নিরাকার, সেখান হ'তে নিরাকারের জ্ঞান হয়। উহা সমভাবে চলে। ওখান হ'তে সাকার ও নিরাকার উভয়ই জানা যায়।

নিরাকারেও যখন সাকার আছে—তখন যিনি যত বেশী উঠেন, তিনি তত দূরে গিয়াও সাকার পেতে পারেন। সাকার ধরিতে না পারিলে সেখানে তাহার নিরাকার। আর একজন ঐ নিরাকার আকার দেখিতে পাবে—কিন্তু তাকেও কত ক'রে গিয়ে নিরাকার বল্‌তে হবে। বাস্তবিক নিরাকার একেলা নাই। যে যতই উঠুক—সাকার আছেই। আবার সাকার মাত্রেই নিরাকার আছে।

সুতরাং নিরাকারের জন্য সাকার ত্যাগ করিয়া যেতে হয় না। সাকা-

রের জন্যও নিরাকার হ'তে চ্যুত হতে হয় না। সাকার ও নিরাকার উভয়ই নিত্য। তবে সমসূত্র হ'লে কেহই লক্ষ্য হয় না। যে কোন আকারে নিরাকার পাওয়া যায়। কাজেই যে কোন আকারে অন্য আকারও পাওয়া যায়।

৬/২/২৫

আবরণের কাজ না হইয়া বিক্ষেপের কাজ হয় না। মনে কর—একজন মায়াবী মায়ার দ্বারা আমাকে লোহা সোনা ক'রে দেখাচ্ছে। সে কি করিল?

১। প্রথমে আমার লোহা দৃষ্টি বা লোহার স্বরূপ ঢাকিয়া ফেলিল। বাস্তবিক কিন্তু স্বরূপ স্বপ্রকাশ,—ঢাকা পড়ে না। জীবের দৃক্‌শক্তি—রশ্মিই আচ্ছন্ন হয়। যাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই সে পূর্ববৎ লোহাই দেখিবে। আর যদি সকলেরই আচ্ছন্ন করে, তবে কেহই লোহা দেখিবে না। দেখিবে না বটে, কিন্তু লোহাটি পূর্ববৎই থাকিবে।

অথবা কাহারও দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন না করিয়া প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা লোহাকে সঙ্কোচ করিয়া অণুমাত্র করিল। তখন উহা থাকিল বটে কিন্তু সকলের পক্ষে অণু বলিয়া কার্যতঃ অদৃশ্য হইল।

প্রথমটি সহজ—দ্বিতীয়টি কঠিন।

২। তারপর সোনার চিত্র—বা ভাব—ঐ দৃষ্টি-রশ্মির অগ্রভাগে ফোটাইল। ইহা বিক্ষেপ বা সৃষ্টিশক্তি। যে স্থানে লোহা ছিল, সে স্থানে যাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, তারা দেখল এখন সোনা।

আবরণ করা এবং আবরণের পরে প্রদর্শন (বিক্ষেপ) করা—উভয়ে দ্রষ্টার একাগ্রতার হানি আবশ্যক। অর্থাৎ আমি যেন লোহা দেখিতেছি—আমি যদি অনিমেষ দৃষ্টিতে, স্থিরভাবে লোহা দেখিতে পাই—ক্ষণেকের জন্যও যদি আমার দৃষ্টিবিচ্ছেদ না ঘটিতে দিই, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিরশ্মি আবৃত হইবে না। সদাই আমার দৃষ্টির সম্মুখে লোহা থাকিবে। লোহাই যদি থাকিল, তবে আর সোনা দেখার সম্ভাবনা কোথায়? যখন আমার পলক পড়িবে, তখনই আবরণ পড়িবে—পলক না পড়িলে আবরণ আসিবে না। পলক পড়ে বায়ুর চাঞ্চল্যে। অতএব যখন বায়ু স্থির, সুতরাং দৃষ্টি স্থির; তখন দৃষ্টি একাগ্র, অবিচ্ছিন্ন,—তখন আবরণ নাই। তাই আকাশ নিরাবরণ। বায়ুর সহকারিতাতেই আবরণের কার্য হইয়া থাকে। তবে যদি লোহাটিকে কিছু দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে ঢাক্‌না খুলিয়া উহাকে তিরোহিত দেখান খুব সহজ। কারণ, তখন আমার একতান দৃষ্টির সহিত উহা যুক্ত নহে। তাই উহাতে অন্য জিনিসের মিলন, ক্রিয়া হতে পারে।

তবে আবার দৃষ্টি স্থির থাকিলেও যদি মায়াবী অতি প্রবল হয়, তবে

আমাকে চঞ্চল করিয়া, বায়ু ক্ষুব্ধ করিয়া, মোহিত করিবে। কিন্তু আমি যদি স্তিমিত বায়ু না হইয়া শুদ্ধ আকাশ হই, আমার দৃষ্টিরশ্মি যদি প্রাকৃত-সত্ত্বের না হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বের হয়, সুতরাং একটানা হয়, অমিশ্র হয়, অখণ্ড হয়—তাহা হইলে জগতের কোন মায়াবীই আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। কারণ, নিমেষের হেতু আমাতে নাই বলিয়া আমাতে তার শক্তি-প্রয়োগ বা তদ্দ্বারা বিক্ষোভ চলিবে না। এমন কি, ঢাক্‌না দ্বারা লোহাকে ঢাকিয়া পুনরায় ঢাক্‌না সরাইলেও লোহাই থাকিবে—তিরোহিত হইবে না।

তবে সে যদি লোহাকে অণু করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর। অবশ্য ইহা আবরণ নহে। আমার বিশুদ্ধদৃষ্টিতে তাহা ত' প্রতিভাত হইবেই। তবে স্থূলদর্শীর হবে না বটে। অন্যে মনে করিবে—লোহা অন্তর্হিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—লোহাকে অণু করা ঐশী শক্তি বা বিশুদ্ধসত্ত্বের ব্যাপার। তাহা মহামায়ার খেলা—মায়ার নহে।

বাস্তবিকপক্ষে লোহাকে সোনা কেহ করিতে পারে না। লোহার উপাদান, সোনার উপাদান সদাই আছে। স্থিরদৃষ্টিতে দুই-ই নিত্য—তবে পৃথক্‌ভাবে অব্যক্ত, সেখানে লোহা বা সোনা বলা চলে না। যুক্ত বা বৈষম্যভাবে ব্যক্ত, সেখানে যার ভাগ বেশী, সেইরূপ প্রতীতি হয়।

যে শক্তি এই উপাদানের সাম্য বা বৈষম্য সম্পাদন করিতে পারে, তাহা ঐশীশক্তি। ইহা আবরণ করে না, তবে আবরণ বলিয়া মনে হয় বটে।

মায়াতেই আবরণ ও বিক্ষেপ। এ বিক্ষেপ = প্রাতিভাসিক চিত্র উদ্‌ঘাটন। ইহা ভ্রম।

আমি যদি বিশুদ্ধসত্ত্ব হই, লোহার দিকে তাকাই,—কোন প্রাকৃত সত্ত্বশালী মহাশক্তিধর পুরুষ তাকে আবৃত বা তৎস্থানে ভাবান্তরের সঞ্চার করিতে পারিবে না। আবরণ = তমঃ, বিক্ষেপ = রজঃর কার্য। বিশুদ্ধসত্ত্বের কাছে তাহা আসিবে না। আমার দৃষ্টি হতে তাহা দূরে সরিবে না। তবে বিশুদ্ধ-সত্ত্বশালী অন্য কেহ যদি অধিকতর সত্ত্ববান্ হয়, তবে অবশ্য পারিবে না। সেখানে প্রবলতর শক্তিতে আমার বল অভিভূত, আমার দৃষ্টি রুদ্ধ (= মায়া-বরণ নহে, মহামায়া); লোহা প্রকটিত। এ লোহা ব্যবহারিক।

বিশুদ্ধসত্ত্ব অনন্ত—ভগবানে। তাই তাঁর শক্তি অসীম ও অপ্রতিহত। খণ্ড শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত জীবও তাঁর অধীন। তাতেও আবরণ আসতে পারে। তবে উহা মহামায়া, সেও জগৎ দেখতে পারে, উহাও মহামায়া। আবার মহা-মায়া নিষ্ক্রিয় হ'লেই স্থিতি। মহামায়ার খেলাই লীলা। এ আবরণ ও বিক্ষেপে জ্ঞান হারায় না। হারানবৎ হয় মাত্র।

৯/২/২৫

(জ্ঞানহীন—ইচ্ছাহীন)

শুদ্ধ চৈতন্য

একাগ্র	ঈশ্বর	অদ্বৈতজ্ঞান+ইচ্ছা	সঙ্কল্পমাত্র
বিক্ষিপ্ত	জীব	দ্বৈতজ্ঞান+ইচ্ছা	সঙ্কল্প+বিকল্প

শুদ্ধ জড়

(জ্ঞানহীন—ইচ্ছাহীন)

অদ্বৈতজ্ঞানের বিকাশ হলেই জীবে ঐশ্বর্য আসতে আরম্ভ হল। ইচ্ছা তখন ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু ক্রম আছে—তাই তারতম্য আছে। কিন্তু অদ্বৈত-জ্ঞানের অদ্বৈতাংশে ত' তারতম্য নাই ; কারণ, ভেদ নাই। কিন্তু সেখানে ঐশ্বর্যও নাই। অথবা নিরোধাত্মক তাহাই পারমৈশ্বর্য বা পরমসাম্য। সেখানে জ্ঞান ও ইচ্ছা সাম্যময়—তাই নিষ্ক্রিয়, নির্মল, পূর্ণ।

অদ্বৈতজ্ঞানের আবির্ভাব হ'লেই অদ্বৈতভাব হ'ল বটে, কিন্তু সংস্কার আছে ব'লে দ্বৈতসম্বন্ধ আছে। এই দ্বৈতসম্বন্ধ, সংস্কার—ঊর্ধ্বে কমিয়া আসে, তাই অদ্বৈতবোধ অধিকতর নির্মল হয়। ইহার চরম অবস্থায় অদ্বৈত-বোধ পূর্ণ—সেখানে দ্বৈতবোধ মোটেই নাই—পরক্ষণেই অদ্বৈতবোধও নাই। তাহা শান্তি।

যেখানে সকল বাসনা সমষ্টি বা বিন্দুরূপে বর্তমান, যাহার পরক্ষণই নিরোধ, তাহাই ঐশ্বর্যের প্রান্তভূমি। ওখান হ'তেই ক্রিয়াশক্তি আরম্ভ। অর্থাৎ জ্ঞান ও ইচ্ছা সক্রিয়। নিরোধে সবই নিষ্ক্রিয় ও সাম্য। এই নিত্য ঈশ্বরভাব জীব প্রথমে লাভ করে—তখন ক্রিয়াশক্তির প্রাপ্তি হয়। ইহার পর ক্রিয়াবিরামে জ্ঞান ও ইচ্ছা—বা শিব ও শক্তি, সমান হয়। তাহা সদাশিব। সাধারণতঃ তাহাকে সাম্য বা ব্রহ্ম বলে। বস্তুতঃ তাহাও শক্তি। ইহাকে বিশ্লে-ষণ করিলে জানা যায় যে, ইহা শুদ্ধচৈতন্য (শিব) মাত্র, যাহার গর্ভে ইচ্ছা নিহিত বা বিলীন হ'য়ে আছে। এবার ইচ্ছাকে সদাশিব হ'তে উঠাইয়া তুলিলে তিনিই আদ্যাশক্তিরূপে পরিণত হন ; নাম—ইচ্ছাশক্তি বা উমা, তিনি চৈতন্যময়ী হইয়া উঠেন। ইহা সাযুজ্য। অর্ধনারীশ্বর, শিব ও শক্তি মিলিত। ইহার পরেই শিবলিঙ্গ বা শিবতত্ত্ব। তারপর অব্যক্ত।

১০/২/২৫

সদাশিবকে যখন মহাশক্তি স্পর্শ করেন—যখন তাঁর হৃদয়ে উঠেন, তখন সদাশিব শব হ'য়ে যান অর্থাৎ পরমশিবরূপে পরিণত হন। পরমশিব হওয়া আর মহাশক্তি হওয়া একই কথা। অর্থাৎ সদাশিব মহাশক্তির কৃপায় মহাশক্তিতে প্রবেশলাভ করেন।

১১/২/২৫

১। নিরাকার = পরব্রহ্ম, অদ্বৈত।

২। সাকার = শব্দব্রহ্ম, দ্বৈত।

প্রণব বা নাদ সর্বব্যাপক। নিরাকার প্রণবের উপরে। সাকার-মধ্যে প্রতি আকারের বা রূপের স্বাভাবিক নাম আছে। তাহা উহার বীজ। তাহা নাদাত্মক। আকার অনন্ত, তাই বীজও অনন্ত। আকার এক, তাই বীজও এক। যেখানে আকার এক, তাহাই ঈশ্বর। আর তাহার বাচক = প্রণব। যাবতীয় আকার ঐ এক আকারের অংশ। যাবতীয় নাদ ঐ এক মহানাদের অংশ। অংশী = ব্যাপক, অংশ = ব্যাপ্য। অনন্ত আকার = অনন্ত দেবতা। বটের বীজ অতীন্দ্রিয়। তাহার নাদাত্মক দিক্‌টিই প্রথম বিকশিত—তাই তাহা মূল বীজ। এই বীজ হ'তে বৃক্ষ হ'তে হ'লে চাই—

১। ক্ষেত্র, ২। কর্ষণ ও বপন, ৩। জলসেকাদি পরিকর্ম। বটগাছ কোন্‌টি—সকল অবস্থায় যেটি সাধারণভাবে আছে, তাহা। তাহাই বীজের বাচ্য। তাহা প্রস্ফুটিত হয়, অভিব্যক্ত হয়, কালে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়,—সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য ও বটেতর পরমাণু মিলিতে থাকে। বস্তুতঃ এই বটেতর পরমাণুর সংমিশ্রণ-বশতঃই বট-পরমাণু বিকাশপ্রাপ্ত হয়। অভিব্যক্ত হওয়াই স্থূলত্ব লাভ। তাহা বাহ্য সম্বন্ধসাপেক্ষ। বৃদ্ধি প্রভৃতিও তাহাই। বটের বীজ হ'তে বটবৃক্ষের পূর্ণ পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত যে কোন অবস্থা, তাহা একদেশমাত্র, আংশিক।

নাদ হ'তেই রূপের আবির্ভাব হয়। নাদময় বীজমন্ত্রই রূপকে গঠিত করে। ওঙ্কার বা প্রণব হ'তে মহাসত্তার আবির্ভাব হয়। ইহা খণ্ড আকারের সাম্য। ইহার এক অবস্থা জ্যোতি, উচ্চাবস্থা জ্যোতিহীন ব্যাপক আকার মাত্র। ইহার বিকাশ হ'লেই চৈতন্যের বিকাশ (দিব্যচক্ষুর উদয়) হয়, তখন নাদ শেষ হয়। সত্তা হ'তে চিতের বিকাশ হয়। এই চিৎই মহাব্যোম বা চিদাকাশ। সত্তা = ব্যোম বা মহাকাশ, যাতে ত্রিগুণ আছে। চিদাকাশ স্বচ্ছ, গুণাতীত।

ওঙ্কার ভিন্ন মহাসত্তাকে জাগান যায় না। যেখানে ওঙ্কার সদা হচ্ছে, সেখানে মহাসত্তা জেগে আছেন। এই নাদ যেই শ্রুতির অগোচর হন, অমনই নিদ্রা বা মোহ আসিল।

বীজের সহিত মনের সংঘর্ষ করাই সাধনা। এই সংঘর্ষে বীজ বিকশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মন চেতন হ'তে থাকে। বীজ যখন পূর্ণ বিকশিত, মন তখন চৈতন্যময়—অর্থাৎ তখন আর মনের ক্রিয়া থাকে না। তখন মন শুদ্ধ আত্মায় পরিণত হয়। বীজের পূর্ণ বিকাশ দেবতা বা ঈশ্বর,—তাহা শুদ্ধ আত্মারই স্বরূপ। এই পর্যন্ত সাকার রাজ্য।

১৫/২/২৫

স্ব=স্বভাব, পরমাত্মা।

পর=বিষয়=(ক) আন্তর (খ) বাহ্য।

মাঝে আছে মনঃ।

সুতরাং স্বাধীন বা স্বতন্ত্র=স্ব বা স্বভাবের অধীন। ইহাই মুক্তি; ইহা মনের। এক হিসাবে ইহা দাসত্ব বা কৈঙ্কর্য। আর পরাধীন বলিলে বিষয়ের অধীন। ইহা বন্ধন। মনঃকে কাহারও অধীন থাকিতেই হইবে—আশ্রয়-শূন্য হইয়া মন থাকিতে পারে না। আশ্রয়শূন্য হ'লে মন বিলীন হইয়া যায়।

স্বভাবে যখন মন ডোবে, স্বভাবে যখন ভাসে বা চলে, তখন মন স্বাধীন। ইহাই মুক্তাবস্থা। মন যখন স্বভাবের প্রেরণ স্বীকার করে—কর্তৃত্ব ত্যাগ করে—তখন স্বাধীন। সেটা নিষ্কাম ভাব। সে ক্রিয়া নিষ্কাম।

যতক্ষণ মন বিষয়াকর্ষণে চলাফেরা করে, ততক্ষণ বন্ধন। তাহা কামনা।

বাস্তবিক আত্মা (=স্বভাব) ও মন একই।

২৪/৪/২৫

দেহান্তে অতি ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলে নামান কঠিন। অতি সূক্ষ্ম ও তীব্র চিন্তা আবশ্যক। সাধারণ চিন্তা অত দূরে ও উপরে পৌঁছায় না।

একটা কথা আছে। আমি চাই আত্মাকে আনিতে, আত্মা চায় যেন না আসিতে হয়—সে স্থলে সংঘর্ষ হয়। ফলে, আমার আকাঙ্ক্ষা যদি অতি প্রবল হয়—আত্মার না আসার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা—তবে সে আসিবে। আর যদি তার না আসার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয়, তবে আসিবে না। কথা এই—আমি প্রবল-ভাবে তাকে চাহিলেও সে যদি না চায় তবে শুধু আমার বলে তাঁর পক্ষে আসা অন্যায়। বাস্তবিক বল হ'লেও বল নহে। কারণ, আমি প্রবল ইচ্ছা করিলেই তার ইচ্ছা না থাকিলেও ইচ্ছা উৎপন্ন হবে। তখন সেও আপন ইচ্ছাতেই আসিবে। তাই বলাৎকার নহে—স্বেচ্ছা; অথচ বলপ্রয়োগও বটে।

অবতারও ঈদৃশ। জীবের ইচ্ছাতেই ভগবানের ইচ্ছা হয়। তাই তিনি আসেন।

কিন্তু এমন স্তর আছে যেখানে গেলে জীবের ইচ্ছাদি আর পোঁছায় না, সে ইচ্ছা তাঁকে স্পর্শই করে না। সেখানে নিজের ভয় নাই। কারণ, পরেচ্ছাকৃত স্বেচ্ছা সেখানে নাই। যে স্বেচ্ছা আছে, তাহা যথার্থ স্বাতন্ত্র্য।

২৩/৫/১৯২৫

(১)

কর্তৃত্বের মূল কৃতি—ইচ্ছা নহে। ইচ্ছার উদয় পূর্বসংস্কারে হয়—সেই ইচ্ছার দিকে yield করা বা না করা ইহা কৃতি। ইহাই কর্তৃত্ব।

দেবতারা কর্তা নহেন, তাঁদের দেহ কর্মদেহ নহে; কারণ, তাঁদের ইচ্ছা হয় ও তৎক্ষণাৎ তার পূর্তি হয়। কৃতির অবকাশ থাকে না, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অবকাশ থাকে না, choice থাকে না।

কর্তৃত্ব যখন থাকে না, তখনও ইচ্ছার উদয় হয়। সে ইচ্ছার মূল কি? স্বভাব।

এই স্বভাব দুই প্রকার—

(ক) যোগমায়া (খ) মায়া।

পূর্বস্থলে ইচ্ছার উদয় হয় ও পূর্তি হয়—কৃতির আবশ্যকতা হয় না। ইচ্ছা-পূর্তি—আনন্দ-অবস্থা। ইচ্ছা উদিত হইলে বিলম্ব হয় না কেন? কারণ, চিন্তামণি-রাজ্য, পূর্ণ রাজ্য,—বিলম্বের হেতু নাই।

উত্তর-স্থলে রাজ্য অভাবের ও অপূর্ণতার। তাই ইচ্ছার উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্তি হয় না। সেই জন্য প্রাপ্তির জন্য কৃতি হয়। এখানে কর্তৃত্ব আরম্ভ। পূর্ণের রাজ্যে কর্তৃত্ব নাই; অভাবের রাজ্যেই কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব গেলেই চেষ্টা, ক্রিয়াদি, moral life, সব গেল—মায়া কাটিল। তখন লীলা। সেটা যোগমায়ার রাজ্য। পৌর্ণমাসীর রাজ্য।

(২)

নিঃশ্বাসের পরেও ফাঁকাকে বা স্থিতিকে স্পর্শ করে, প্রশ্বাসের পরেও করে। ফাঁকাকে স্পর্শ করিয়া আবার ফিরে কেন? ঋণ শোধ না করিয়া ফাঁকে গেলে সেখানে থাকিতে পারে না। কারণ, ফাঁকায় গেলেই ফাঁকা হয় না। ফাঁকা =সাম্য, সন্ধি; যেখানে 'ক' ও 'খ' এই দুইটি এক হয়েছে—এই এক=শূন্য। 'ক' ও 'খ'-তে যতক্ষণ বিরোধ আছে, ততক্ষণ ফাঁক নাই। 'ক'-র অস্তিত্বই বিরোধ—'ক' যেখানে সমাপ্ত হ'ল, অথচ 'খ' সেখানে নাই। তাই তাহা 'ক' ও 'খ'-র অতীত সন্ধি। 'ক' যেখানে ফুরাইল, সেখানে অসীম, 'খ' যেখানে ফুরাইল, সেখানেও অসীম। 'ক' ও 'খ' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও সেই অসীম।

যার ঋণ শোধ না করিয়া আমি শূন্যে যাব, সে আমাকে টানিয়া বাহির করিবে। বস্তুতঃ প্রকৃত শূন্যে আমার প্রবেশ হবে না। অন্যের জিনিস সঙ্গে নিয়া শূন্যে প্রবেশ চলে না। নিজের জিনিস রাখিয়াও যাওয়া চলে না। যে আমাকে টানে, তাতে আমি আছি, আমাতে সে আছে। নতুবা আকর্ষণ অসম্ভব হ'ত।

(৩)

সব ঋণ ত' শোধ হবে। মাতৃ-ঋণ শোধ হবে কি? বাকি সব ঋণ-শোধে নিত্যধামে বাস। মাতৃ-ঋণ শোধে নির্বাণ। আমার সবই মা হ'তে—আদ্যাশক্তি হ'তে। তাঁর ঋণ শোধ হ'লে আমার কিছুই ত' থাকিল না। শুদ্ধ আমিও নাই। কারণ, তাও আদ্যাশক্তি-প্রসূত।

মাতৃ-ঋণ শোধ মানে আমি মা'তে ফিরিয়া গেলাম—dissolved হ'লাম। মা ত' চির-নির্বাণেই আছেন, তাই আমিও নির্বাণ পেলাম। কিন্তু তবু মা'র কোলে শুইয়া। মাকে না ধরিয়া হয় না।

(৪)

যে আমাকে টানে আমিও কি তাকে টানি? অবশ্যই টানি। আকর্ষণ পরস্পর। তবে কখনও একদিকের টান অনুভবে আসে, অপর দিকেরটা আসে না। তার কারণ আছে।

কেউ যদি স্বচ্ছ হইয়া বসিয়া থাকে, তবে কেউ তাকে ভালবাসলে সেও তাকে ভালবাসবে—ইচ্ছা করিয়া নহে, স্বভাবে। নিজে সাক্ষিভাবে তা' লক্ষ্য করিতে পারিবে। সে সমদৃষ্টি থাকিয়াও পক্ষপাতী হবে।

২৭/৫/২৫

(১)

একটা প্রবল জ্যোতি থাকিলেই তাহার পাশে ছায়া থাকিবে। জ্যোতির অনুকূল হ'লে তাকে জানা যাবে না। যদি জ্যোতির প্রতিকূল হওয়া যায়, তা' হ'লেই দ্বন্দ্ব হয়; ফলে, ছায়াপাত। ছায়াতে নিজের অংশও থাকে। জ্যোতির অনুকূলতাকে স্বচ্ছতা বলে, সে স্থলে জ্যোতি নিজের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, বাধা পায় না। বাধা নাই বলিয়া ছায়া নাই। ইহাই দেব-ভাব। দেবতার ছায়া নাই।

জ্যোতিও বৈষম্যশক্তি। সাম্যশক্তিতে অবশ্য ছায়া পড়ে না। সাম্যশক্তির গতি নাই—তাহা আলোয় ও আঁধারে সমভাবে আছে। সে বাধা দেয়ও না, বাধা পায়ও না। স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ তার কাছে সমান—তার বিচার নাই, বোধ নাই।

দেহ জ্যোতিকে বাধা দেয় কেন? উভয়ে বিরোধ আছে। এই বিরোধ হ'তেই সংঘর্ষ, তাহার ফলই ছায়াসম্পর্ক।

দেহ হ'তে যদি জ্যোতির কণা ফিরাইয়া দেওয়া যায় ও জ্যোতি হ'তে দেহের কণা ফিরাইয়া আনা যায়—তা' হ'লে দেহ বা জ্যোতি বিশুদ্ধ হবে। তাই সাম্য হবে, বিরোধ থাকবে না। তখন দেহও সাম্যশক্তিময়, জ্যোতিও তাই।

(২)

আলোর একটা source আছে। আঁধারের কি তাহা নাই? Source না জানলে ছায়ার উৎপত্তি বুঝা যাবে না। ছায়া source-এর বিপরীত দিকে জাত হয়।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাক্—নিদ্রা = নিরোধ, বৃত্তিহীনতা। তার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যদি 'ক' চিন্তায় একাগ্র থাকা যায়, ত' হ'লে বৃত্তিরোধের অন্তে যখন স্বভাবতঃ বৃত্তির পুনরুদয় হবে, তখন ঐ 'ক'-কে অবলম্বন করিয়াই হবে—তখন 'ক'-র সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রথম হইতেই হবে। অন্য-বৃত্তির উদয়ই হইবে না।

————————oo————————oo————————oo————
ক ক' খ খ' গ গ'

প্রবাহের অন্তে 'ক', পরে শূন্য, পরে 'ক'-ই আদি। 'ক'-র পূর্বে বিক্ষেপ, 'ক'-র পরেও বিক্ষেপ, এইরূপ সর্বত্র।

এই 'ক' যদি সাকার হয় তা' হ'লে 'ক'-র সাক্ষাৎকার, ভোগ ইত্যাদি করিয়া (স্বপ্নবৎ, স্বর্গে, ইত্যাদি) ফিরতে হবে, আবার জাগতে হবে। যদি 'ক' সাকার + নিরাকার হয়, ত' হ'লে ভোগের অবসানে শুদ্ধ নিরাকারেই স্থিতি হবে, ফিরবে না, আর যদি 'ক' নিরাকার হয় তা' হ'লে ভোগও হবে না, একেবারে সাম্যে স্থিতিলাভ হবে।

(৩)

আকাশ অসীম বটে, কিন্তু গাছ বাড়িয়া কোন স্থানে থামিয়া যায়। থামার কারণ গাছেই আছে। যদিও অনন্তকাল বাড়িলেও কোন বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ, আকাশ অনন্ত ও অবাধক, তথাপি বাড়ার সীমা আছে। বীজেতে যে বৃদ্ধিশক্তি আছে তাহা যখন সবটা ব্যয়িত হয়, তখন আর বাড়ে না। কিন্তু তখনও অন্যান্য শক্তি থাকে, সেগুলি বিকাশ পেতে থাকে।

জীবও তাই সসীম বলিয়া একখানে যাইয়া তাহাকে থামিতে হয়। সেখানেই সে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। যার যেখানে সীমা, সেই সীমার পারেই অসীম। অসীমে ব্যাপক। সীমা কল্পিত। কল্পনা, বোধ, সীমাবদ্ধ।

বোধ লইয়া অসীমে ডুব দেওয়াতে অসীমের আনন্দ পাওয়া যায়। তাই ভাল। অসীমে যাইয়া বোধ হারান, কিংবা বোধ হারাইয়া অসীম হওয়া—নির্বাণ, ভাল নহে। দ্বৈতাদ্বৈতই মধুর। সীমাবদ্ধ হ'য়ে অসীমে গিয়া সীমা হারান, আবার কূলে উঠা—ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত। পরা ভক্তি। অসীমকে স্পর্শ না করা (=দ্বৈতভাব) যেমন খারাপ, দ্বৈতকে স্পর্শ না করাও তেমনি।

(৪)
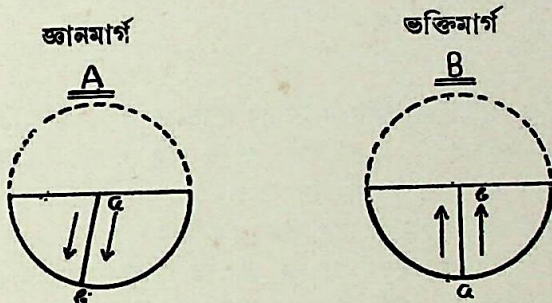
A a=আমি এ স্থলে আমি=ঈশ্বর, পূর্ণাহন্তা।
b=তুমি তুমি=জীব, অপর অহং
B a=আমি আমি=জীব
b=তুমি তুমি=ঈশ্বর

অব্যক্ত=প্রথম পুরুষ

(৫)

ইহাই তিন গুণ হতে ৫ ভূত উৎপত্তির প্রণালী। ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ=পুরুষ, ইহাও তিন গুণাত্মক; অধোমুখ ত্রিকোণ=প্রকৃতি, ইহাও তিন গুণাত্মক। কারণ, যখন প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর পৃথক, তখনই উভয়ই গুণ-ময়, বৈষম্যময়। যখন সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতি ও পুরুষও একাকার। সেটা ত্রিকোণ নহে। চতুরস্র।

(৬)

দুইয়ে সৃষ্টি নাই। দুই সরলরেখায় অবচ্ছেদ হয় না। সৃষ্টির প্রণালী এই—
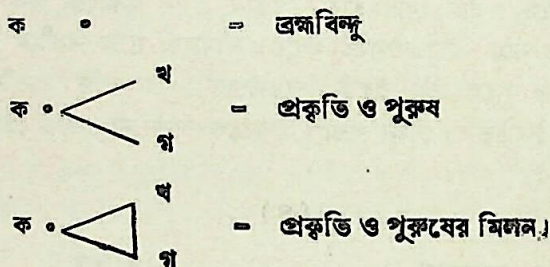
প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন নানাভাবে হ'তে পারে। এটা ঠিক যে, 'ক' 'খ' = 'ক' 'গ' সর্বদাই। মিলন মানে 'খ' ও 'গ'র যোজনা। তবে 'খ' 'গ' সে 'ক' 'খ' বা 'ক' 'গ' র সমান হবে, তা না-ও হ'তে পারে। যখন সমান হয় সম-ত্রিবাহুর উদ্ভব। যখন না হয়, তখন সম-দ্বিবাহু।

এইরূপ চারিদিকেই হয়। 'ক' 'খ' জাতীয় রেখার সংখ্যা যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে figure-টি উক্ত সংখ্যক সরলরেখাবেষ্টিত polygon হবে। 'ক' 'খ' = একটি শক্তি। সুতরাং সসীম সংখ্যক শক্তির বিকাশ হইলে বহু-রেখাবেষ্টিত রাজ্য হবে—ততসংখ্যক রেখাবেষ্টিত যতগুলি শক্তির বিকাশ। কিন্তু তাতেও কেন্দ্র হ'তে প্রান্ত সর্বদিকেই সমদূর। আর অসীম সংখ্যক শক্তির বিকাশ হ'লে figure-টি বহু সরল-রেখাবেষ্টিত হবে না। একটি বক্ররেখাবেষ্টিত হবে—বা বৃত্তাকার বা মণ্ডল হবে। বৃত্তের পরিধিতে অনন্ত সরলরেখা আছে। কারণ তাতে অনন্ত বিন্দু আছে। যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে একটি সরলরেখা। এতাদৃশ সরলরেখা অনন্ত, তাই সমষ্টিতে এক বক্ররেখারূপে আভাসমান। কারণ, প্রতি বিন্দুই কেন্দ্র হ'তে সমদূরস্থ।

এখানে বহু রহস্যের ব্যাপার আছে। রেখা বস্তুতঃ বিন্দুসমষ্টি নহে। সুতরাং সমগ্র পরিধিটি বিন্দুসমূহের সমষ্টি নহে। কারণ, বিন্দুদ্বয় যত ঘনিষ্ঠই হউক, মাঝে ফাঁক স্বীকার করিতে হয়। নতুবা দুই বিন্দু হয় না। মাঝে ফাঁক থাকিলেই দ্বৈত রহিল, সুতরাং continuity থাকিল না,—বিচ্ছেদ আসিল। সুতরাং এক রেখা হ'ল না। অতএব পরিধিটি এক নিত্য রেখা, অনন্ত, অদ্বয়, অবিচ্ছিন্ন—বিন্দুসংঘাতময় নহে। তাতে অনন্ত বিন্দুর

সমাবেশ আছে—তাতে তাদাত্ম্যভাবে একাকার হইয়া। অতএব বিন্দুর সহিত বিন্দুর ভেদও আছে—তখন, যখন মাঝে ফাঁক আছে, যখন অবিচ্ছিন্ন রেখা অপ্রকাশমান। আর রেখা প্রতিভাত হ'লে দুই বিন্দু অদ্বয়ভাবাপন্ন, মাখামাখি।

(৭)

তিনটি রাস্তা। প্রতি রাস্তায়—ক্রিয়া-জ্ঞান-ভাব।

১। ক মার্গ (কর্মমার্গ)
- (a) ক্রিয়া i.e. অশুদ্ধত্যাগ
- (b) প্রাপ্তি = ঐশ্বর্য
- (c) ঐশ্বর্যে মজে যাওয়া

২। খ মার্গ
- (a) ত্যাগ, ঐশ্বর্যত্যাগ
- (b) অভেদ প্রকাশ
- (c) প্রকাশে তন্ময়তা

৩। গ মার্গ
- (a) অদ্বৈতত্যাগ
- (b) ভেদাভেদ প্রকাশ, ভাবদেহের আবির্ভাব
- (c) তাতে তন্ময়তা

(৮)

গাছগুলি নিশ্চয়ভাবে স্থির হয়ে আছে। যেই বাতাস আসিল, অমনি নড়িতে লাগিল। বাতাসের সঞ্চারে বৃক্ষের ক্রিয়াদি। বাতাস সরিয়া গেলে আবার নিষ্ক্রিয়। এই গাছই পুরুষ। বাতাস = শক্তি। শক্তি পুরুষকে যেমন খেলায়, পুরুষ তেমনি খেলে। শক্তি যখন স্থির, স্থির বায়ুর মতন, তখন পুরুষ নিষ্ক্রিয়।

পুরুষ বহু, অথচ এক। শক্তির সচল অবস্থায় পুরুষের বহুত্ব অনুভূত হয়। শক্তি নিশ্চল হইলে পুরুষের বহুত্ব অনুভবে আসে না।

(৯)

বালক অবস্থা, অর্থাৎ যৌবনের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মময় ভাব। বিচার নাই, আত্মজ্ঞান নাই। যুবক নিজেকে যুবক বলিয়া জানে, বালক নিজেকে বালক বলিয়া বোঝে না।

বিশুদ্ধসত্ত্বে অন্য উপাদান নাই বলিয়া তাহা সদাই অনন্য। অথচ জানে

না যে, সে অনন্য। যে শুদ্ধ ভক্ত সে নিজেকে ভক্ত বলিয়া বোঝে না, যে শুদ্ধ-জ্ঞানী, সে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া বোঝে না। যদি বোঝে তবে সে শুদ্ধ নহে তাহার মধ্যে মিশ্রণ আছে। অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত না হইলে কোন জিনিসের আত্মপ্রকাশ হয় না।

৩১/৫/২৫

শ্বাস-প্রশ্বাসে মন রাখিলে কি হয়? মনে প্রাণে ঐক্য হয়। প্রাণের অন্তে স্থিতি, অপানেরও অন্তে স্থিতি। অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের সন্ধি =স্থিতি বা শূন্য। মন যখন প্রাণের সঙ্গে চলিবে তখন প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঐ শূন্যকে স্পর্শ করিবে। সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস অসাড়ে চলিতেছে; কারণ, মনঃ বিষয়ে আছে, প্রাণের চলাচল লক্ষ্য করে না। কিন্তু মনঃ প্রাণের অনুগামী হইলে প্রাণের ক্রিয়া consciously হয়। ইহা নিরন্তর হইতেছে। সুতরাং self-consciousness নিরন্তর জাগিয়া থাকে।

ঐ শূন্য স্পর্শ করার দরুণ ক্রমশঃ মনও শূন্য বা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, সূক্ষ্ম বা শুদ্ধ হইয়া যায়, মনের আবরণ বা স্থূলাভিনিবেশ কাটিয়া যায়, কর্তৃত্ব কাটে।

তখন অদ্বৈত হয়; স্বভাবই চালক হয়। যা হয় তাহা স্বভাবের খেলা।

১/৬/২৫

শুধু মনের নিরোধ হ'লে কোন ফল নাই। তাহা ত' জড়ত্ব বা জড়সমাধি। মন এখন স্থূলভাবাপন্ন; যদিও বিক্ষিপ্ত। তাহাকে গুটাইয়া আনিলেও সে স্থূলই থাকিবে। তাহাকে সূক্ষ্ম করা চাই, বাসনারহিত করা চাই। সে ত' আর বিনা আগুনে হবার জো নাই। সুতরাং খুব তীব্র সংঘর্ষ চাই। তবে জ্ঞানাগ্নি জ্বলিবে—তখন বাসনা কাটিবে, মন স্থূলরহিত হবে, চেতন হবে।

অতএব মন্ত্র চাই। মন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে তেজঃ বিকাশ হ'য়ে মনের আবর্জনা কেটে যায়। ইহাই মনের ত্রাণ, বা মনের চৈতন্য-সম্পাদন, বা মনের শোধন।

মন স্থির হ'য়ে সংঘর্ষ হ'লে সংঘর্ষ খুব জোরে হয়—চট্ করিয়া আগুন জ্বলে। মন বিক্ষিপ্ত রাখিয়া সংঘর্ষ করিলে সংঘর্ষ-নিমিত্ত একটা চৌম্বক ধার্ম বিকাশ পায়, তখন ছড়ান মনঃ-কণা আসিয়া একত্র হয় ও সঙ্গে চৌম্বক-তেজ জ্যোতিতে পরিণত হয়।

সেইজন্য মন্ত্রহীন স্থিরীকরণ অপেক্ষা স্থিরত্ব-সাধন-রহিত মন্ত্রসংঘর্ষ শ্রেষ্ঠ। অবশ্য উভয়ের সমন্বয় সর্বশ্রেষ্ঠ।

মন যদি স্থির হয়, অথচ প্রাণ স্থির না হয়, ত' হ'লে উহা প্রকৃত স্থিরতা নহে। ওস্থলে বাসনার তরঙ্গগুলি কাঁপে—তাই স্বপ্ন উদিত হয়। ওস্থলে প্রাণ প্রবল, মন দুর্বল মাত্র। জাগ্রৎ অবস্থায় মন প্রবল, প্রাণ দুর্বল।

মনঃ প্রবল হ'লেই কর্তৃত্ববোধ জাগরূক থাকে। তাই কর্ম হয়। স্বপ্নে মনঃ দুর্বল, কর্তৃত্ববোধ শিথিল, তাই স্বপ্ন কর্মপ্রধান নহে, ভোগাবস্থামাত্র। Passive। Passive বটে, কিন্তু যে চিত্র খেলে তা বাসনামূলক। তাই Subjecttive. ব্রজের ভাবও Passive বটে, কিন্তু সেখানে বাসনা নাই বলিয়া যাহা কিছু উঠে তাহা স্বভাবজাত। সেখানে কর্তৃত্বও নাই, বাসনাও নাই। সেখানকার বাসনা বাসনা নহে ; তাতে মন নাই, 'অহং'-এর যোগ নাই, তন্মুখে সব অনন্য। হেতু যোগমায়া।

সাধারণতঃ জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ধ্যানে যে সকল দর্শন হয়, তাহার অধিকাংশ সংস্কারমূলক। জ্ঞানোদয়ের পরে যে দর্শন তাহা সত্যদর্শন ; কারণ তখন কর্তৃত্ব ও বাসনা বিলুপ্ত। যাহা কিছু উদিত হয়, তাহা স্বভাব হ'তেই হইয়া থাকে, তাই real, objective.

মনের ও প্রাণের ঐক্য ভিন্ন জ্ঞান হবে না। এই ঐক্যসম্পাদন মনের (স্থির বা স্থিরীকৃত) সংঘর্ষবশতঃ হ'তে পারে, বা প্রাণের সহিত মনের অনুগমনবশতঃ হ'তে পারে। মনের বাসনা মনে ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ মন উজ্জ্বল নহে। মন উজ্জ্বল হ'লে আর তাতে থাকতে পারে না, মনকে ছেড়ে অব্যক্ত হ'য়ে যায়। ইহাই জ্ঞানলাভে বাসনা-নিবৃত্তি। আর যদি কৌশলে মনকে শূন্যে নিয়ে যাওয়া যায় (যেমন প্রাণের অনুগামী করিয়া) তাহা হ'লে ক্ষণকাল মনঃ=শূন্য; তাই বাসনা নিরাধার বলিয়া অব্যক্ত। এই প্রকারে মন ও বাসনার সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হ'য়ে আসে। চরমে বাসনা অব্যক্ত হ'য়ে যায়; তখন মনও অব্যক্ত বা শূন্যস্থ বা নিষ্ক্রিয় বা সূক্ষ্ম। বাসনাযুক্ত মন স্থূল, বাসনারহিত মনঃ সূক্ষ্ম।

২০/৬/২৫

শুধু চাহিলেই পাওয়া যায় না। আমি যদি ইচ্ছা করি মধু খাব, তা' হ'লেই মধু পাওয়া যাবে না। কর্মদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে উপাদান তৈয়ার করতে হবে। মধুর উপাদান নাই, শুধু চাহিলেই কি মধু পাওয়া যায়? ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলে, চাহিবামাত্রই পেতে পারি। না থাকিলে শুধু চাহিলেই পাওয়া যায় না। চাওয়া মানে=অভাববোধ। যদি আমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে, তবে চাওয়ামাত্রই পাব। স্বভাবই অক্ষয় ভাণ্ডার। স্বভাবের সঙ্গে যোগ হ'লে ইচ্ছামাত্রই প্রাপ্তি হয় বা সৃষ্টি হয়। ইচ্ছা, পূর্ণের সঙ্গে যোগে, পূর্ণতা লাভ করে।

স্বভাবচ্যুত হইয়া ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। বিকার না কাটিলে, প্রকৃতিকে না পাইলে, ইচ্ছা পূর্ণ হবে না, অভাব কাটিবে না।

তবে কি আমাদের সব চাওয়া নিষ্ফল? না। আমাদের চাওয়াতে ও পাওয়াতে দৈশিক ও কালিক ব্যবধান আছে। যদি যোগী হইতাম, স্বভাবের সহিত যোগ থাকিত, তা হ'লে এ ব্যবধান থাকিত না। চাওয়ামাত্রই পেতাম। যেখানে ও যখন চাওয়া, সেখানে ও তখনই পাওয়া। দেশ ও কাল মায়াজন্য। মায়ার গাঢ়তাবশতঃ উহাদের দৈর্ঘ্য। শুদ্ধ মায়াবশতঃ তাৎকালিক ও তদ্দেশ-গত প্রাপ্তি। ইচ্ছা না হ'লে মায়াও নাই,—সুতরাং প্রাপ্তিও নাই। অর্থাৎ অভাবও নাই, তাই অভাবের নিবৃত্তিও নাই। ইহা শুধু চিদ্‌ভাব, আনন্দ নহে। কারণ, অভাব হইয়া তার নিবৃত্তি হওয়াই আনন্দ। অভাবের বোধ না থাকিলে আনন্দের স্বাদ থাকে না। সুতরাং শক্তি ভিন্ন যেমন অভাব হয় না, তেমনি আনন্দও হয় না। স্বভাবে থাকিয়াও অভাব হ'লেই আনন্দ। কারণ, অভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই ভাব—মহাভাবই —আনন্দ। স্বভাবে থাকিয়া অভাব না হ'লে আনন্দ নাই। পূর্ব অবস্থা= স্বভাবে স্থিতি, কিন্তু তাতে আনন্দ নাই। অবশ্য নিরানন্দও নাই। শুধু চিদ্‌ভাব মাত্র। দ্বিতীয় অবস্থাও স্বভাবস্থিতি—আনন্দময়।

নিম্ন জগতে এই আনন্দই ফলরূপে নামিয়া আসে। শুধু চাহিলে হয় না। একাগ্রভাবে চাওয়া আবশ্যক। তা' হ'লেই অল্প-বিস্তর যোগাভ্যাস হয়। তখন ফল পাওয়া যায়—সেই অনুপাতে। বিয়োগ যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে আনন্দ সুখ-দুঃখরূপে খণ্ডিত। যদি সম্পূর্ণই বিয়োগ হয়, তবে শুধুই সুখ আর দুঃখ—আনন্দ কিছুই নাই। সেটা দ্বৈত বা অজ্ঞান অবস্থা। তখন জীব ও ঈশ্বরে যোগ নাই। যদিও স্বভাব ও ঈশ্বরে যোগ আছে। তাই ঈশ্বরে আনন্দ আসে। জীবে তা' ভেঙ্গে সুখ-দুঃখ হ'য়ে যায়। এটাও চাওয়ারই ফলে কিন্তু জীব ঈশ্বরও জানে না, স্বভাবও না; তাই মনে করে—না চাওয়াতে এসেছে। তবে কি সে সুখ-দুঃখ চেয়েছিল? না। চেয়েছিল আনন্দ; অথচ সাকার সীমাচ্ছন্ন। অথচ সে যোগী নয়। তাই তার চাওয়াতে বহু জাতীয় জিনিস মিশেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে তার যোগ ত' আছেই—সে জানুক বা না জানুক। তাই ঈশ্বরানন্দ (তমোজাতীয় সাকার) জীবের কাছে বিচিত্ররূপে এসে পড়ে। সুখ চেতে গিয়ে দুঃখও এসে পড়ে।

২৫/৬/২৫

দেহ শূন্যে উঠে কেন? সাধারণতঃ সজাতীয় তাড়িত বিকর্ষণ করে, বিজাতীয় তাড়িত আকর্ষণ করে। পৃথিবীর তাড়িত বা পৃথিবীস্থ যাবতীয়

বস্তুর তাড়িত পরস্পর বিপরীত। তাই পরস্পর আকর্ষণ করে। যদি দেহে বা বস্তুতে পৃথিবীর সজাতীয় তাড়িত উৎপাদন করা যায় তা' হ'লে দেহ পৃথিবী ছাড়াইয়া উঠিবে।

বাস্তবিকপক্ষে যাহা কিছু পৃথিবীর অংশ তাহা পৃথিবীতে আশ্রিত, পৃথিবী তার আশ্রয়। পার্থিব বস্তু পৃথিবীকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী হ'তে তাহা কোন কারণবশতঃ চ্যুত হ'লেও স্বভাবতঃই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে। পৃথিবী জড়।

এইপ্রকার যাহা কিছু চেতন, তাহা চৈতন্যের অংশ, তাহা চৈতন্যে আশ্রিত, চৈতন্য তার আশ্রয়। চেতন বস্তু চৈতন্যকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। কোন কারণবশতঃ খণ্ডচৈতন্য চৈতন্যরাশি হ'তে চ্যুত হ'লেও স্বভাবতঃ চৈতন্যেই ফিরিয়া আসিবে। আকাশ চৈতন্য।

চৈতন্য হ'তে চ্যুতির কারণ জড়সম্বন্ধ; পৃথিবী হ'তে বা জড় হ'তে উদ্ধারের কারণ চৈতন্য-সম্বন্ধ। অর্থাৎ চৈতন্যের অংশের সঙ্গে জড়ের অংশ মিশ্রিত হওয়াই বন্ধন। জড়ের অংশের সঙ্গে চৈতন্যের অংশের মিলনই মুক্তি। শুদ্ধজড়=নিত্যবদ্ধ; শুদ্ধচৈতন্য=নিত্যমুক্ত।

শুদ্ধচৈতন্য = আকাশ। ।	↑ক	
		+০
শুদ্ধজড় = পৃথিবী।	খ	

গুরুত্ববশতঃ পতন, লাঘবে উত্থান। কোন বস্তুকে যখন হাতে করিয়া উঠান যায়, তখন তাহা উঠে কেন? আমি ইচ্ছা করিয়া—প্রযত্ন করিয়া—চেষ্টা করিয়া উঠাই। গুরুত্ব যাহার ধর্ম, ইচ্ছা তাহার বিপরীত বস্তুর ধর্ম। কারণ, গুরুত্বের ফল যাহা, এতাদৃশ ইচ্ছার ফল তাহার বিপরীত। গুরুত্ব যদি জড়ের ধর্ম হয়, ইচ্ছা চেতনের ধর্ম। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উপরে যাহা আছে, যদি নামাতে হয়, তবে ইচ্ছা করিয়া নামাতে হয়। উপরে যাওয়া বা থাকা যার ধর্ম, নীচে নামান তার বিপরীত বস্তুর ধর্ম। অতএব উত্থান-পতন ইচ্ছা হ'তেই হ'তে পারে। কাজেই ইচ্ছা জড়ের স্বভাব নহে, চৈতন্যেরও স্বভাব নহে। উভয়েরই অতীত। ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বসহকারে বা চৈতন্যযোগে প্রেরিত হ'লে উপরে উঠায়, তমঃ বা জড়-সাহায্যে সঞ্চারিত হ'লে নীচে নামায়। ইহাই কার্যসাধিকা শক্তি। তবে ঊর্ধ্ব বা অধোগমনের হেতু আছে। কোন বস্তু যেন 'চ'। 'চ' যত উপরে উঠিবে, ততই সে লঘু হবে। গুরুত্ব কমিবে। যতটুকু গুরুত্ব কমে ততটুকু

'চ' হ'তে যায় কোথায়? যদি আমি হাতে ধরিয়া 'চ'-কে উঠাই, তবে ঐ গুরুত্ব আমাকে আশ্রয় করে। আর সেই পরিমাণে আমার সত্ত্ব 'চ'-কে আশ্রয় করে। আমি হাত ছাড়িয়া দিলেই আমার সত্ত্ব আমাতে ফিরিয়া আসে, উহার গুরুত্ব উহাতে যায়। 'চ'-কে আমার ছাড়া তাই উচিত হয় না। তবে তাকে ০ পর্যন্ত যদি লইয়া যাই, তা' হ'লে ছাড়িলেও সে আর পড়িবে না। সে স্থলে আমার প্রেরিত সত্ত্ব ও উহার জড়ত্ব সমসূত্র—বা সত্ত্ব=তমঃ। ইহা সাম্যভাব। ইহার পরে জীবভাবে আর উত্থাপন সম্ভবে না। এবার বিশুদ্ধসত্ত্বের কিঞ্চিৎ সঞ্চারেই ০ ভেদ করিয়া 'চ' ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে। এবার সত্ত্বের প্রাধান্য—তাই অবরোহ সম্ভবে না।

অতএব প্রাকৃত সত্ত্ব 'চ'-তে সঞ্চারিত হ'লে তাহা স্বতঃ ঊর্ধ্বগমনশীল হবে না। অপ্রাকৃত বা ঐশ্বরিক সত্ত্বসঞ্চারে অবশ্যই হবে। ইহার কারণ,—প্রাকৃত সত্ত্বে জড়ত্ব আছে। সেই জড়ত্ব 'চ'-র জড়াংশে মিলিত হইয়া বাধা দেয়। তবে যদি 'চ'-র জড়ভাগ ও 'সত্ত্বে'র জড়ভাগ মিলিয়া সত্ত্বাংশের কম হয়, তবে অবশ্য উঠিবে। কিন্তু উঠিয়াই পড়িবে। সত্ত্বে জড়াংশ না থাকিলে আর পড়িবে না।

৪/৭/২৫

স্তরবিন্যাস, উপলব্ধির—এইরূপঃ

১। সান্ত। এখানে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। কারণ প্রবাহ বাধিত হয়। বাধা-বোধই দুঃখ। ইহা পরিচ্ছিন্ন বোধের রাজ্য=সংসার (জীব-ভাবের সঞ্চার হ'তে অন্ত পর্যন্ত)।

২। অনন্ত। এখানে আনন্দ, কারণ প্রবাহ বাধা পায় না। ইহা ঈশ্বরাবস্থা। ইহার সীমা নাই।

৩। অতীত। এখানে দুঃখ বা আনন্দ কিছুই নাই। কারণ বোধ নাই।

ঈশ্বরাবস্থায় প্রভা কেবল চলিতেই থাকে—প্রবাহের অন্ত নাই। জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞেয় অল্প; কিঞ্চিৎ জ্ঞেয়ের বিকাশ হ'লেই তাহাই জ্ঞানপ্রবাহকে বাধা দিবে। জ্ঞানপ্রবাহ ঐ জ্ঞেয়রূপ প্রাচীরে আসিয়া ঠেকিয়া যাইবে। ছাড়াইয়া চলিবে না। অর্থাৎ জ্ঞান সবিষয়ক হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতভাব থাকিবে—তাহাই জীবভাব। তাতে দুঃখস্পর্শ আছেই। প্রবাহের রোধক যাহা, তাহাই বিষয়, বিষয়=প্রাচীর, সীমা। বিষয়ই বাধক। বিষয়ই বৈষম্য।

ঈশ্বরাবস্থা শুদ্ধজ্ঞানের অবস্থা, তাতে জ্ঞেয় বা বিষয় মগ্ন, লুপ্ত। প্রবাহ আছে, কিন্তু অপ্রতিহত। শুদ্ধজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি এই স্তরেরেই জিনিস। এখানে যখন সীমা নাই, তখন ব্রহ্মভাব 'অতীত' বলিয়া মানা কেন? বাস্তবিকপক্ষে

পরমার্থতঃ এ দুই-ই একই। আনন্দ অসীমে গেলেই আর তাহা আনন্দ নহে; বোধও তাই, ইচ্ছাও তাই। স্বরূপতঃ তাই অনন্ত=স্বভাব। তা ঠিক আনন্দ নহে। জীব যখন জ্ঞেয়ের প্রাচীর ভাঙিয়া অসীম তত্ত্বে প্রবেশ করে, ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হয়—সে আনন্দ পায়। খালি অসীমে আনন্দ নাই, যদি তাতে সসীম না আসে। জীব, জীব বলিয়াই সীমাবন্ধ। সাধনা দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ হয় মাত্র; সীমালঙ্ঘন হয় না। অথচ সীমালঙ্ঘনও হইতে পারে। তা যে কোন অবস্থায় সম্ভবপর। অবশ্য অনন্তের সংসর্গবশতঃ। একটি জীব=ক, আর একটি জীব=খ। 'ক'-র শক্তি=৫। 'খ'-র শক্তি=১০। অবশ্য উভয়েই শক্তিকে বাড়াইতে পারেন। ইহাই পুরুষকার। কিন্তু বাড়াইয়া অনন্ত শক্তি করিতে পারিবেন না। কারণ, বাড়ান ক্রমিক, ক্রমের ত' শেষ নাই। ক্রম ত্যাগ করিতে পারিলে অবশ্য অনন্তে প্রবেশ হইবে; নতুবা নহে। ক্রম ত্যাগ করিতে হইলে অনন্তের স্পর্শ চাই। অসীমের সাক্ষাৎ স্পর্শ না পাইলে সীমা অসীম স্তরে যাইতে পারে না—কোটি মহাকল্পেও পারে না। ক্রমশঃ সীমা কখন অসীম হয় না। অসীম যদি স্পর্শ করে তবে সীমা যে কোন অবস্থায় অসীমে যেতে পারে। যেতে পারে বটে, কিন্তু একটু কথা আছে। 'ক' ৫ পর্যন্ত যাইতে পারে --ইহাই তাহার সীমা। 'খ'-র সীমা ১০। অসীমে গেলে 'ক' যে আনন্দ পাইবে 'খ' তাহার দ্বিগুণ পাইবে। যত বড় পাত্র সমুদ্রে ডুবান যায়, সেই পরিমাণ জল সে ধারণ করিবে। অসীম=শূন্য। কখনই বাধা দিবে না। 'ক' ৫ পর্যন্ত অবাধে চলিবে, তার শক্তি ততটুকু—তারপর সে অভিভূত হইয়া যাইবে, বোধ হারাইবে। সীমা সে কখনই পাইবে না। সংসারেও সে ৫ পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু সেখানে যাইয়া ধাক্কা পায়—আর যাইতে পারে না। রাস্তায় অনেক ধাক্কা খায়। এই বাধাই দুঃখ। যতটুকু অবাধিত ভাবে যায়, ততটুকু সুখ। তাই সুখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত। তাই তার শক্তি ৫ হ'লেও তদুপযোগী আনন্দ সে পায় না। ঘাত-প্রতিঘাতে অনেকটা খরচ হইয়া যায়। অনন্তে ৫ পর্যন্ত যাইয়াই সে বোধ হারায়—বাধা কিন্তু পায় না, তাই দুঃখ নাই। কিন্তু নিজের বোধ রক্ষা করিতে পারে না। তাই আনন্দও আর উপলব্ধি করিতে পারে না। অনন্তে চলিতে মোটেই আঘাত নাই, প্রতিঘাত নাই। যতটুকু চলা যায়, তত-টুকুই আনন্দ। তবে শক্তি সীমাবন্ধ বলিয়া শক্তির বিলয় হইয়া গেলেই আনন্দও থাকে না। কারণ, শক্তির বিলয় মানে ৫ পর্যন্ত পৌঁছান, তারপর আর শক্তি নাই বলিয়া বোধ নাই, ইচ্ছা নাই, সুখ নাই—কিছু নাই। আছে স্বভাব। স্বভাবের পূর্বাবস্থা—আনন্দ।

অতএব বুঝা যাইতেছে 'ক'ও অনন্তে গিয়া আনন্দ পায়, 'খ'ও পায়। 'খ'র শক্তি অধিক বলিয়া 'খ' অধিক কাল চলিতে পারে, আপন ব্যক্তিত্ব ও বোধ রক্ষা

করিতে পারে, আনন্দ তীব্রতর ভাবে পায়। কিন্তু যেই ১০ শক্তি লীন হইল, অমনি স্বভাবে ডুবিল। জীব শক্তি লইয়াই অনন্তে প্রবেশ করে। শক্তির ক্রিয়া হইয়া নিবৃত্তি হইলেই স্বভাবকে পায়। শক্তির ক্রিয়াবস্থাই আনন্দোপলব্ধি। যতক্ষণ জীবের শক্তি আছে, ততক্ষণ সে দ্বৈতে আছে। অদ্বৈতকে স্পর্শ না করিলে, ভেদভাবে, দুঃখে আছে (সুখ+দুঃখ); অদ্বৈতকে স্পর্শ করিলে, ভেদাভেদভাবে, আনন্দে আছে। যেই শক্তি নিষ্ক্রিয় হইল, অমনি অভেদভাব—আর বোধ নাই, আনন্দ নাই। অভেদ-বোধও নাই। স্বভাব। অভেদ-বোধ থাকে ব'লে তা ভেদাভেদ অবস্থাতেই হইয়া থাকে।

স্বভাবে জোয়ার-ভাঁটা আছে। তাই আবার 'ক' 'খ' বাহির হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 'ক'-নিষ্ঠ শক্তি সক্রিয় হয়, 'খ'র শক্তিও তাই। শক্তিলয়ে 'ক'-তে ও 'খ'-তে ভেদ ছিল না; কারণ ভেদক ধর্ম অব্যক্ত হইয়া ছিল। শক্তির প্রাকট্যে উভয়ে ভেদ জাগে, অবশ্য অভেদের কোলে। কারণ, অনন্তেই জাগে। সান্তে আর ত' আসে না। অনন্তকে একবার স্পর্শ করিলে আর সান্তে আসিতে হয় না।এ নিত্যলীলা অনন্তেই হয়।

এখন প্রশ্ন এই—'ক' যখন জাগিল, তখন তার শক্তি কি? এখনও কি তার শক্তি ৫ই? না অধিক?

এখানে অনেক রহস্য আছে। এই যে 'ক'র শক্তি ৫, 'খ'র ১০ বলিয়াছি —যদি এতাদৃশ শক্তি লইয়া অনন্তে প্রবেশ করা হয়, তবে স্বভাবপ্রাপ্তির পরে 'ক'র শক্তি ৬, 'খ'র ১১ অবশ্য হইবে। এটা যোগীর অবস্থা। ক্রমশঃ স্বভাব-সংস্পর্শে ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হইবে। ইহার সীমা নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—৫, ১০=খণ্ডশক্তি। সকলের মূলে যে অখণ্ডশক্তি (=১) আছে, তাহা লইয়া—জাগাইয়া—যদি অনন্তে প্রবেশ করা যায়, তাহা হইলে সে শক্তির বিলয় হইবে না বলিয়া আনন্দের অবসান হইবে না—সে শক্তি অভিভূত হয় না, নিষ্ক্রিয় হয় না, তাই সে ক্ষেত্রে লীলা নিত্য। খণ্ডশক্তি লইয়া অনন্তে নামিলে—শিবসাগরে ডুবিলে, সেই খণ্ডশক্তি শিবের সঙ্গে রমণ করিয়া সাম্য-ভাব প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধশিবই থাকেন। এই রমণ অবস্থা পর্যন্ত লীলা, আনন্দ। তারপর সাম্যভাব, শান্তি। অখণ্ডশক্তি লইয়া নামিলে নিত্যরমণ, নিত্যরাস—তার বিশ্রাম নাই। তাই সেখানে শান্তভাব নাই, সাম্যভাব নাই।

অখণ্ডশক্তি=মহাভাব; খণ্ডশক্তি=খণ্ডভাব। অতএব মহাভাবকে আশ্রয় না করিলে নিত্যলীলায় অধিকার হয় না। খণ্ডভাব সে অসীম তত্ত্বকে নিরন্তর চেতনভাবে ধারণ করিতে পারে না। সামর্থ্যানুসারে ধারণ করিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, বোধ হারায়, ভেদাভেদের অতীত হয়।

খণ্ডশক্তি অখণ্ডশক্তিরই অংশ। খণ্ডশক্তি লইয়া অনন্তে যাঁরা নামেন, তাঁরা

যোগী। ইঁহারাও অনন্তের মধ্যে একবার ডোবেন, একবার ভাসেন। ডুবিবার পর ভাসিলে শক্তির বৃদ্ধি হয়। আবার ডোবেন, আবার ভাসেন। সঙ্কোচ-প্রসারবশতঃ। ফলে ক্রমিক ঐশ্বর্যবৃদ্ধি।

অখণ্ডশক্তি লইয়া যাঁরা অনন্তে নামেন, তাঁরা রসিক। ইঁহাদের ডোবা নাই, শুধুই ভাসা।

তাই রাধাকৃষ্ণের লীলাশেষ নাই—উভয় নিত্যজাগ্রত। গোপ-গোপী সখা-সখী—খণ্ডভাব—রাসান্তে বিলীন হইয়া যায়, অবশ্য রাধা-অঙ্গে। রাধার বিলয় নাই।

অতএব খণ্ড বা অখণ্ডশক্তি সহকারে অনন্তে নামিলে ঐশ্বর্য বা আনন্দ (রস) পাওয়ার উপায় আছে। শক্তি না জাগাইয়া অনন্তের স্পর্শ পাইলে ফল নির্বাণ বা আত্মবিলোপ। যতটুকু আমার শক্তি, ততটুকুই আস্বাদন। শক্তি যদি কিছুমাত্র না জাগান থাকে, তা' হ'লে কোনই আস্বাদন, জ্ঞান, বোধ নাই। অনন্তের স্পর্শমাত্র অভিভূত অবস্থা আসিবে।

এই সুপ্তশক্তি জীবের অনন্তস্পর্শজন্য অভিভব এবং কিঞ্চিদুদ্বুদ্ধশক্তি জীবের অনন্তস্পর্শজন্য কিঞ্চিদানন্দবোধানন্তর অভিভব—উভয়ে ভেদ আছে কি? আছে। প্রথমাবস্থায় যখন অনন্তস্থ প্রসারণ-শক্তিবশতঃ জীব বাহির হইয়া পড়িবে, তখন সে কার্যতঃ নূতন জীব, তার পূর্বস্মৃতি নাই; সুতরাং জীবনের continuity নাই, তার সঞ্চার-স্থান অ-শূন্য অর্থাৎ সৃষ্টজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড। শূন্য=শিব। শক্তি অচেতন বলিয়া শূন্যে গতি হ'তে পারে না। দ্বিতীয় অবস্থায় জীব নিজেকে পুরাতন বলিয়া বুঝিতে পারিবে, পূর্ব-স্মৃতি থাকিবে, জীবনের continuity-তে বিচ্ছেদ থাকিবে না। জাগ্রৎ শক্তি শিবে বিলীন হয় বটে—খণ্ড জাগ্রৎ শক্তি পূর্ণ জাগ্রৎ শক্তিতে (=শিবে) অভিভূত হয়, কিন্তু বাহির হইলেই সে জাগ্রৎই থাকে, কাজেই পূর্ণভাব সব বজায় থাকে। এতাদৃশ জীবের সঞ্চার-স্থান শূন্যপ্রধান লোক, চিন্ময় ধাম। অখণ্ড জাগ্রৎ শক্তি বা পরমশিব শূন্যে ক্রীড়া করেন।

শক্তির উদ্বোধন না করিয়া অনন্তের স্পর্শ=মৃত্যু বা জড়সমাধি। শক্তির উদ্বোধনই জ্ঞানলাভ—ইহাতেই মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সংসার, ব্রহ্মাণ্ড—সব মৃত্যুরাজ্য। শক্তির পূর্ণ উদ্বুদ্ধতা যেখানে, সেখানেই অমরত্ব। শক্তি একেবারে অনুদ্বুদ্ধ যেখানে তাহা পূর্ণমৃত্যুভূমি। যেখানে শক্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উন্মেষ আছে, তাহা আপেক্ষিকভাবে অমরধাম। সেখানেও মৃত্যু আছে —তবে দীর্ঘজীবনের অন্তে।

পরেই ভগবদ্ধামে প্রবেশ, সেটা ভক্তি-পদবাচ্য। জ্ঞানের বিকাশ না হইলে আনন্দলাভের সম্ভাবনা কোথায়? শুধু আনন্দই ঈশ্বর-ভূমি। ইহাই ভক্তি।

শক্তি জাগিলেই কিন্তু অনন্তে প্রবেশ হয় না। শক্তির জাগরণের সীমা নাই। শক্তির জাগরণই আত্মজ্ঞান। ইহার অবশ্য ক্রমশুদ্ধি আছে। শক্তির পূর্ণ জাগরণ=পূর্ণ আত্মজ্ঞান। কিন্তু ইহা অনন্তের সংস্পর্শ ভিন্ন হইতেই পারে না। কারণ, ক্রমশঃ জাগরণে সর্বশক্তির পূর্ণ জাগরণ হ'তে পারে না। সহস্র যুগেও হয় না। তাই অনন্তের সংস্পর্শ চাই। অনন্তের সংস্পর্শ পাইবামাত্রই অপূর্ণ আত্মজ্ঞান তদনুরূপ আনন্দে পরিণত হয়। এই আনন্দই ভক্তি। জ্ঞান সসীম বলিয়া, শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া, তার নিবৃত্তি বা অভিভব হ'লেই—স্বভাবলাভ। আবার অধিকতর শক্তি লাভ হয়। ফলে আত্মজ্ঞান পূর্ণতর হয় ও আনন্দ বা ভক্তি আরও গাঢ়তর হয়। এইরূপ চলিতে থাকে। শেষ নাই।

অখণ্ড শক্তির জাগরণেই পূর্ণ আত্মজ্ঞান—তাকে প্রেম বা মহাভাব বলে। পূর্ণ আত্মজ্ঞানে আত্মাই পরমাত্মারূপে জ্ঞাত হন—ইহাই প্রেম। জ্ঞান পূর্ণ বলিয়া, ইহার আবরণ নাই। তাই স্বভাবপ্রাপ্তি হয় না। ইহাই নিত্যলীলা—রাধা ও কৃষ্ণের।

৬/৭/২৫

ঘরে আলো রহিয়াছে—আমার ছায়া পড়িয়াছে। ক্রিয়া করিতে করিতে এমন অবস্থা আসে যে ছায়া লুপ্ত হইয়া যায়; নববিকশিত জ্যোতিতে মগ্ন হইয়া যায়। সে জ্যোতি প্রদীপের জ্যোতির সজাতীয় নহে। কারণ, ঐ জ্যোতিতে তখন গৃহস্থিত ছায়া ও দীপালোক উভয়ই সমভাবে বিলুপ্ত হয়, সমস্ত ঘর একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ চন্দ্রিকাবৎ উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। এই নববিকশিত জ্যোতি ক্রিয়াবৃদ্ধির সহিত অধিক সমুজ্জ্বল হয়।

এই জ্যোতিই জ্ঞান, আত্মশক্তি। ইহা স্থূলভাব বিনাশী। এই জ্যোতির প্রতিষ্ঠা হইলে, ইহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, যাহাতে ইহার প্রয়োগ করা যাইবে, তাই স্বচ্ছ হইবে, তাহার অন্তঃস্থল দেখা যাইবে। কিন্তু জ্যোতি বেশী তীব্র হইলে কিছুই দেখা যাইবে না—শুধু জ্যোতিই দেখা যাইবে। একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান ভেদাভেদের অবস্থা, তখন জ্যোতি পাতলা থাকে। জ্যোতি ঘন হইলে একবিজ্ঞানই থাকে। তারপরে তাও থাকে না।

এই জ্যোতি search-light-এর মতন। ইহা ছড়ায় না। যতক্ষণ এই জ্যোতির বিকাশ থাকে, ততক্ষণ নিজের ছায়া থাকে না। এই জ্যোতিই দিব্যালোক—দেবলোক। তাই দেবতাদের ছায়া নাই। জ্যোতির ক্রম আছে, দেবলোকের বা দেবভাবেরও ক্রম আছে। এই জ্যোতির একটি বিশেষ অবস্থার বিকাশ হইলে সেই আলোকে চারিদিকে যাহা কিছু দেখা যাইবে তাহা সেই দেবলোকের বস্তু। এই প্রকারে যে কোন লোক দর্শন করিতে হইবে তদনুরূপ

জ্যোতির বিকাশ করিলেই তাহা দেখা যাইবে। আমাদের চক্ষুর জ্যোতি, বাহ্য আলোক, দেহ, বাহ্যপদার্থ—সবই স্থূল। ঊর্ধ্বে উঠিলে সবই সূক্ষ্ম হইয়া আসে।

এই যে আকাশ ইহার আবরণ যতই অপসারিত হইবে ততই সেই সূক্ষ্ম-জ্যোতির বিকাশ হইবে। এ আকাশ স্থূল। পানা-পুকুরের পানা সরাইলে যেমন স্বচ্ছ জল পাওয়া যায়, যেখানে সরান যায় সেখানেই পাওয়া যায়—এ আকাশেরও তেমনই সর্বত্রই সেই জ্যোতি পাওয়া যায়। শুধু আবরণ সরাইতে হয় মাত্র। আবরণ সরাইলে এই আকাশই চিদাকাশ, নতুবা ইহা ভূতাকাশ। ভূতই বীজ, আবরণ, বাসনা, জড়, স্থূল ইত্যাদি। চিদনুপ্রবেশে ইহা হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়। আবার ইহাতেই বিলয় হয়—যখন চিদংশ সরিয়া যায়। চিত্তাকাশ মধ্যবর্তী অবস্থা।

ত্রাটক দ্বারাই আকাশকে ভেদ করিতে হয়। স্থির ও সমদৃষ্টি না হইলে ভেদ হয় না। এই স্থূলাকাশই মায়া। বিষম দৃষ্টি মায়িক দৃষ্টি। তাতে আকাশকে অতিক্রম করা যায় না। লৌকিক দৃষ্টি বিষম দৃষ্টি। তাই ইহার দ্বারা মায়ার কবল এড়ান যায় না। সমদৃষ্টি হইলে জড় থাকিবে না, ভেদ জগৎ থাকিবে না। কিন্তু ভেদজগতে থাকাকালে সমদৃষ্টি হওয়া যায় কি প্রকারে? 'ক' ও 'খ' দুইটি বিন্দু। এই উভয়ের মধ্যে যে সমরেখা সরলরেখা তাহা এক ও অদ্বিতীয়। 'ক' যদি 'খ'-তে ঠিক লক্ষ্য করে, তা' হ'লে অন্য কিছু দেখা যাবে না, শুধু 'খ'ই দৃশ্য হবে। এই দৃষ্টিরেখা সমরেখা, সরল-রেখা, ব্রহ্মনাড়ী, শূন্যপথ। প্রথমে তা' হয় না। এইজন্য জগতে সরলরেখা নাই, হইতেই পারে না। কারণ, যে শক্তি 'ক' হ'তে প্রবাহিত হইয়া 'খ'তে যাচ্ছে, তাহা মধ্যপথে ইতস্ততঃ অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া পড়ে। ফলে, রেখা সরল হয় না। নানাপ্রকার বক্রতাবিশিষ্ট হয়। ছড়াইবার কারণ, চারিদিক্‌কার আকর্ষণ। যদি শূন্য ভেদ করিয়া শক্তির প্রবাহ হইত, তাহা হইলে তাহা বক্র হইত না। শূন্যে কোন আকর্ষণ নাই। তাই বিক্ষেপ নাই। জগতে সেইজন্য বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী, তাই সরলরেখা হয় না।

'ক'=মন ও ইন্দ্রিয়। 'খ'=গুরুদত্ত "বীজ" ও "বস্তু"। মন ও ইন্দ্রিয় একত্রীভূত করিয়া বীজ ও বস্তুকে লক্ষ্য করিবে। বলা বাহুল্য—এই লক্ষ্য সরল নহে। কিন্তু একটু রহস্য আছে। বীজ চেতনীকৃত ও মনে নিহিত বলিয়া মনও কিঞ্চিদংশে চেতনীকৃত (দীক্ষাকালে)। সুতরাং কিয়দংশে শূন্য-প্রাপ্তি হইয়াছে। কারণ, শক্তির শূন্যস্থাবস্থাই চৈতন্য। নিরালম্ব শক্তিই চৈতন্য। অতএব মূলতঃ লক্ষ্য করিবামাত্রই তাহা সরলরেখাই—কিন্তু বাহিরে সহস্র বিক্ষেপবশতঃ তাহা কুটিলাকার। ক্রমশঃ কুটিলতা ত্যাগ হইলেই শুধু

সরলরেখা থাকিবে। মূল সরলরেখা, লক্ষ্যবৃদ্ধির সহিত তীব্রতা প্রাপ্ত হয়, উজ্জ্বল হয়; ফলে, চারিদিক্‌কার আকর্ষণ ক্রমশঃ অভিভূত হয়, রেখার বক্রতাও কমিয়া আসে। ইহাই বাসনার ক্রমত্যাগের অবস্থা। সরলরেখাটুকু উন্মীলিত জ্ঞানলেশ। চরমে বিশুদ্ধ সরলরেখাই বিরাজমান, মাঝে আর ব্যবধান নাই; এইটি শূন্যস্থিতি, বাসনারাহিত্য, চিদাকাশে অবস্থান বা জ্ঞান-বৈশদ্য।

তাই মায়াতীত চৈতন্যকে আশ্রয় করিলেই মায়া কাটিয়া যায়। শূন্যে না যাওয়া পর্যন্ত বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। শূন্যের স্পর্শ পাইয়া পুরুষকার করিলেই শূন্যভাব বাড়ে, বিক্ষেপ থাকে না, বাসনা থাকে না। চিৎকে আশ্রয় না করিয়া অচিৎ-এর বাহিরে যাওয়া যায় না।

১০/৭/২৫

আকাশ=পিতা=শিব, লিঙ্গ=শুদ্ধচৈতন্য।

পৃথিবী=মাতা=শক্তি, যোনি, পীঠ=জড়ভাব।

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।"

বাইবেলে আছে যে প্রথমে Heaven and Earth রচিত হয়—অর্থাৎ চৈতন্য ও জড়, বা পুরুষ ও প্রকৃতি।

এক হিসাবে Heaven = স্বঃ, স্বর্গ।
Earth = ভূঃ।

উভয়ের মধ্যে "অন্তরীক্ষ"। ইহাই "ভুবঃ"। Firmament.

২৭/৭/২৫

প্রদীপের প্রভা ছড়াইয়া যায়—বস্তু প্রকাশ পায়। চৈতন্যের প্রভা তেমনই ছড়াইয়া গিয়াছে, ব্যাপ্ত আছে। যাহা প্রকাশ পাচ্ছে, তাহাই জগৎ। এই প্রভা গুটাইয়া নিলেই সংহার—তখন কিছুই প্রকাশ পাবে না। প্রথম অবস্থা সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি লয়। অতএব ঘটের সত্তা চৈতন্যের শক্তির ব্যাপনবশতঃ—চিৎ-শক্তি গুটাইয়া আনিলে ঘট অসৎ বা অব্যক্ত। চিৎ-শক্তি ছড়াইলেই ঘটাদি ভাবরাজির সত্তা লাভ হয়। অব্যক্ত ঘট অসৎ। অব্যক্তে চিৎ-শক্তির সঞ্চার হইলেই সৃষ্টি হয়, ঘটাদির সত্তা লাভ হয়, অভিব্যক্তি হয়।

কাজেই পাওয়া গেলঃ—
স্বভাব = অব্যক্ত জ্যোতি
নিষ্ক্রিয় চিৎ-শক্তি=প্রদীপ-কলিকা
সক্রিয় চিৎ-শক্তি=প্রভা
অসৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি=অন্ধকার, যার মধ্যে ঘটাদি একাকার
(চিৎ-শক্তির সঞ্চারে) জগৎ সৃষ্টি=প্রভাপাতে ঘটাদির আবির্ভাব।

প্রভার দুইটি অবস্থা—কখন প্রসারণ, কখন সঙ্কোচ। উভয়ই সক্রিয় অবস্থা। তখন প্রভা পৃথক্। যখন প্রভা নিষ্ক্রিয়, তখন একমাত্র চৈতন্যই আছে। প্রভা অন্তর্লীন।

প্রকৃতি অন্ধকার বা অব্যক্ত বা জড়। তাতে চিৎ-শক্তি পড়িলেই সৃষ্টি হয়। অতএব জড়ও আছে, তবে চিৎ-শক্তির সম্বন্ধ ভিন্ন তাহা যে আছে—তাহা বলা যায় না। তাহা অসৎ, অব্যক্ত। সাধারণতঃ যাহাকে জড় বলি, তাহা ব্যক্ত বস্তু, সুতরাং প্রকাশমান; সুতরাং জন্য; সুতরাং তাতে চৈতন্য আছে। আছে বলিয়াই তাহার সত্তা লাভ হইয়াছে, বোধ হইতেছে—ইত্যাদি। চৈতন্য বিযুক্ত হইলে উহা অসৎ বা অব্যক্ত হইয়া যাইবে।

তবে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য কেন? চিৎ-শক্তি আলোকের ন্যায় সমভাবে পতিত হয়। তাতে বৈষম্য নাই। অতএব আলোকের বাহিরে এই বৈচিত্র্য আছে। শুধু অন্ধকার একই। তাতেও ভেদ নাই। কাজেই জানা যায়—আলো আঁধারের মাঝে এই বৈচিত্র্য-শক্তি আছে। ভগবানের এই দ্বিতীয় শক্তি মহামায়া—যাহার আবর্তনে অখণ্ডসত্ত্ব হইতে নিয়ত খণ্ড বাহির হচ্ছে, অথচ অখণ্ডের ছেদ হচ্ছে না। এই খণ্ডসত্ত্বগুলিও মূলের মতন—অর্থাৎ দীপকলিকা ও প্রভার মতন। এ প্রভাও সঙ্কোচ-বিকাশশীল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অখণ্ডসত্ত্বেও যে চিৎ-শক্তি, খণ্ড-সত্ত্বেও সেই চিৎ-শক্তি। খণ্ড-সত্ত্ব-নিঃসৃত চিৎ-শক্তি হ'তেই শুদ্ধজীবের দৃষ্টিতে শুদ্ধধামের প্রকাশ হয়, উহার সঙ্কোচে শুদ্ধধামের বিলয় তদ্দৃষ্টিতে হয়। অখণ্ড শুদ্ধসত্ত্ব-নিঃসৃত চিদ্ধারা গুটাইলে সকল শুদ্ধজীবের পক্ষেই শুদ্ধধামের লয় সিদ্ধ হয়। সুতরাং শুদ্ধধামের বিকাশ ও বিলয় বাহ্যতঃ ঐশীশক্তির কার্য। আর আন্তরতঃ জীবশক্তির কার্য।

প্রভা সক্রিয় শক্তি। ইহার সঙ্কোচের সীমা কলিকা বা নিষ্ক্রিয় শক্তি। ইহাই শিব। প্রসারের সীমা জড়মণ্ডল বা অব্যক্ত। ঐশীশক্তির প্রসার অনন্ত —কারণ, জড়ে প্রতিহত হয় না। ঐশীশক্তি শুদ্ধচৈতন্য ও শুদ্ধজড় দুইয়ে গতায়াত করে—সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ। যখন ক্রিয়া থাকে না, তখন জড়-চৈতন্য একাকার হয়। উহাই স্বভাব। আর ক্রিয়া-অবস্থায় একপ্রান্তে শিব, অপর প্রান্তে জড়।

খণ্ডসত্ত্ব অখণ্ডসত্ত্বে আশ্রিত ভাবে থাকিলে জীবশক্তিরও ঐ অবস্থা। বস্তুতঃ কিন্তু জীবের শক্তিই নাই। জীব শুধু আধার মাত্র। শক্তি তাতে পড়ে, ছড়ায়, গুটায়। এটা ভেদাভেদ, অসীম-সসীম ভাব।

খণ্ডসত্ত্ব চ্যুত অবস্থায় প্রাকৃত সত্ত্ব বা বদ্ধ জীব—সে আশ্রিত নহে। তার সঙ্কোচ বা প্রসার উভয় সীমাতেই মোহ বা অজ্ঞান বা জীবত্ব-লোপ বা জড়ত্ব।

২/৮/২৫

ভগবানের প্রবেশের বা দেবতাতে প্রবেশের ক্রম এইঃ—

১। সালোক্য

২। সারূপ্য

৩। সার্ষ্টি

৪। সামীপ্য

৫। সাযুজ্য

সালোক্য মানে একই লোকে থাকা। লোক=আলোক, aura, অঙ্গ-কান্তি। ভগবানের লোকেই প্রবেশ করিলেই এক হিসাবে তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করা হইল। কারণ, তাঁহার লোকও তাঁহার দেহের প্রভামাত্র। ইহাই নির্বিশেষ জ্যোতিস্বরূপ। ক্রমশঃ এই জ্যোতির মধ্যে রূপের বিকাশ হয়। নিজেই তখন ভগবদ্রূপ হইতে হয়। কৃষ্ণভক্ত তখন নিজেই কৃষ্ণরূপপ্রাপ্ত। পূর্বে ছিল কৃষ্ণ-প্রভা মাত্র,—সে প্রভা ঘনীভূত হইয়া এখন রূপে পরিণত। রূপের বিকাশ হইলে ক্রমশঃ উপাস্যের শক্তি আবির্ভূত হয়। ইহা ঐশ্বর্য্যভাব। নিজের মধ্যেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হয়। এই ঐশ্বর্য্যাবস্থা কাটিয়া গেলে পৃথক্‌ভাবে ভগবানের অনুভব হয়। পূর্বে দূরত্ববশতঃ তাহা হয় নাই। এখন সামীপ্যভাব। এ অবস্থায় ঐশ্বর্য্যস্ফূর্তি হয় না। কারণ, পরমেশ্বরের সমীপস্থ। মূলের নিকটে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সম্ভবে না। সামীপ্যভাবে ভক্ত দীন, ভগবান্‌ ঈশ্বর। ইহার পাঁচটি স্তর আছে—ভাবানুসারে।

চরমে সাযুজ্য বা যোগভাব। এই যোগভাবই নিত্যভাব। এই পাঁচটি তত্ত্ব মূলে কি?

১। জ্যোতি, সত্ত্ব, জ্ঞান।

২। রূপ

৩। শক্তি

৪। ভক্তি

৫। রস

প্রথমটি সত্ত্বশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভের অবস্থা।

মানুষের সৃষ্টি আলোচনা কর। দেখিবে এই পাঁচটিই আছে।

রস ও ভক্তি ভাবের দিক্‌।

জ্যোতি ও রূপ প্রকাশের দিক্‌। তন্মধ্যে জ্যোতি নির্বিশেষ প্রকাশ বা সত্তা মাত্র। রূপ সবিশেষ প্রকাশ।

৫/৮/২৫

পূর্ণশক্তির একাংশ চঞ্চলা। ইনিই মায়া। মহামায়া স্থির, সম।

চঞ্চলশক্তির অধীন জীব=বদ্ধজীব।

" " অতীত " =মুক্তজীব।

মুক্তজীবও মহামায়ার অধীন।

মহামায়ার আড়ালবশতঃই মুক্তজীবে জীবত্ব-ব্যপদেশ। মহামায়ার কৃপা হইলে মুক্তজীব তাঁহার কোলে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে একাকার হয়। তাঁহার সঙ্গে একাকার হ'লেই তৎকালে জীবভাব অব্যক্ত। সেটা শিব ও শক্তির মিলনাবস্থা —সাযুজ্য। কারণ, মহামায়া নিত্যসংযুক্ত অবস্থা, ভেদাভেদ। সাযুজ্য হ'তে ঐক্যে গেলেই শিবত্ব—নির্বাণ।

মায়ার অতীত হ'লেই মুক্তিপদ।

চঞ্চলশক্তির হিসাব করা চলে। সমগ্র বিশ্বের পরিণাম নিয়ত। স্থিরা শক্তির হিসাব নাই। স্থিরা শক্তি intervene না করিলে, কৃপা না পাইলে, ভবিষ্যৎ ঠিক ঠিক বলা যায়।

৬/৯/২৫

স্থূল দেহ হ'তে বের হ'তে হ'লে অক্ষরেখা ধরতে হবেই। কারণ, ঐ রেখাই ঐক্যভূমি। ঐক্য চিত্তবৃত্তির। বিক্ষেপের হেতু বাসনা বা পঞ্চভূত। ভূতমিশ্রণ নানা। তাই বিক্ষেপ পাঁচ প্রকার। ভূতপ্রাধান্যযুক্ত চিত্তের ঐক্যভূমিও পাঁচ। ভূতরহিত চিত্তের—শুদ্ধচিত্তের—ঐক্যভূমি একই (=ভ্রূ-মধ্য)। ইহাই যথার্থ ঐক্যভূমি।

দেহ হ'তে বাহির হওয়ার পূর্বে বিক্ষিপ্ত মনকে জমাট করতে হয়। বাহির হওয়া=নূতন স্তরে প্রবেশ করা। এক স্তর হ'তে অন্য স্তরে যেতে হ'লে প্রথম স্তরস্থ যাবতীয় শক্তি একত্র করতে হয়। বহুর গতি হয় না। বহু যখন একে পরিণত, তখন সেই এক যাবে। গমনের পূর্বে সংহার আবশ্যক। সৃষ্টি=বহু হওয়া। সংহার=এক হওয়া। উভয়ই বাসনা বা স্থূলের রাজ্যে। একে বাসনা আছে—তাই বহু হয়। বহু এক হ'লেও বাসনা থাকে। উভয়ই স্থূল। বাসনা যখন থাক্‌বে না, তখন স্থূলের অতীত হবে। ব্রহ্মপথ পাবে। নতুবা জন্মমৃত্যু চলতে থাকে। স্থূলের ব্যাপার চল্‌বে।

সাধারণ জীব যখন মরে, তখন তার শক্তি সব একত্র হয়—অক্ষরেখা অবলম্বন করে। বাসনা বা স্থূল তত্ত্ববিশেষের প্রাধান্যানুসারে অক্ষরেখার বিন্দুবিশেষে জমে। প্রতিক্রিয়া ভ্রূ-মধ্যে অবশ্যই হয়। সেখান হ'তে চারিদিকে অসংখ্য রেখা চলিয়া গিয়াছে। ভাবানুরূপ রেখা ধরিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক

রেখার প্রান্তে একটি দৃশ্যলোক আছে। সেই লোকে গতি হয়, ইত্যাদি। যোগী ইচ্ছানুসারে ঐ সব লোকে যেতে পারেন। অসংখ্য লোক আছে—অক্ষরেখার সঙ্গে সকলেরই সূত্রসহকারে যোগ আছে। যেমন ইচ্ছা, তেমন রেখা-সম্বন্ধ, তেমন দৃশ্যলোকে গতি। মনেরই গতি।

মন যদি শুদ্ধ বৈরাগ্যযুক্ত হয়—যদি স্থূল বাসনা না থাকে—তবে সে কোথায় যাবে? ইচ্ছা নাই ব'লে গতিও নাই, দৃশ্যলোকও নাই, আলম্বন নাই—চারিদিক্ শূন্যাকার। মন নিরালম্ব, নিষ্ক্রিয়, গতিহীন। ইহা প্রকৃতি-লয়।

ইহার ঊর্ধ্বে মন নিজে যেতে পারে না। পূর্বস্থানেই পুরুষকারের সীমা। ঊর্ধ্বরাজ্যে যেতে হ'লে আশ্রয় নিয়া যেতে হয়—গুরুর আশ্রয়। পূর্বাবস্থা নিরাশ্রয়। এ অবস্থায় মনের প্রাধান্য নাই। চৈতন্যের প্রাধান্য—মন আশ্রিত। এটা ভ্রূ-মধ্য হ'তে সোজা ঊর্ধ্বগতি।

সাধারণ লোকে মৃত্যুকালে ব্রহ্মপথ পায় না—ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা চলে না। সুষুম্নার অনন্ত শাখা চারিদিকে সূর্যরশ্মিরূপে ছড়ান আছে—তার কোনটা ধ'রে যায়। এগুলি বাসনাযুক্ত পথ—ফলে, দৃশ্যদর্শন, ভোগাদি লাভ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই সূর্যরশ্মিময়—সূর্যরশ্মি যেখানে নাই তাহা অব্যক্ত, তমঃ, সৃষ্টির বাহির। তাহার ঊর্ধ্বে চিদ্রাজ্য।

বাসনা ত্যাগ না হ'লে ব্রহ্মপথ পাওয়ার উপায় নাই—যদিও সে পথও অক্ষরেখা হ'তেই আরব্ধ হ'য়েছে। বাসনাত্যাগ না ক'রে যে একাগ্রতা, তাতে ব্রহ্মপথের আদ্যাবিন্দু লাভ হয়। গতি হ'লে সেখান হ'তে ব্রহ্মলোকে গমন। না হ'লে প্রকৃতি-লয়, স্থিতি। বাসনা থাকিলে সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করিয়া লোক-লোকান্তরে গতি হয়। মৃত্যুকালেই হউক, যোগীরই হউক, স্থূলদেহের ত্যাগেই সূর্যরশ্মিমালা মধ্যে কোন রশ্মিতে স্থানবিশেষে অবস্থিতি হয়। সেখান হ'তে সমগ্র স্থূল-জগৎ দেখা যায়। স্থূলজগৎ তাহাতেই আশ্রিত। নিজের স্থূল-দেহও ঐ জগতের অন্তর্গত। যে স্থান বা দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা হয়, অমনি তার সঙ্গে রেখার উদয় হয়। রেখা=নাড়ী। অন্তে সেই দৃশ্য। এ সব রশ্মি ধ'রে ঊর্ধ্বে উঠা যায় না। প্রকৃত ঊর্ধ্বরশ্মি সব রশ্মি হ'তে উপর-দিকে সরলভাবে উঠেছে। তাহা শূন্য—কোন দৃশ্য নাই। সেটা ধরলে আর স্থূল চোখে পড়ে না। সেই শূন্য অতিক্রম করলেই পরমাত্মা-সবিতা। রশ্মি সবিতা হ'তেই আস্‌ছে। কিন্তু রশ্মি হ'তে সবিতা দেখা যায় না। শূন্য দেখা যায়। সবিতা হ'তে দেখা যায় একমাত্র সবিতাই—শূন্যও নাই, রশ্মিও নাই।

২৮/৯/২৫

মহাসত্তা=ব্যাপকতা বা ব্রহ্ম।

ইহা খণ্ডসত্তা ব্যেপে সর্বত্রই আছে। কিন্তু এখন জানা যাইতেছে না, উপলব্ধি হয় না, তাই অসৎকল্প। ইহাই পারমার্থিক সত্তা। আমাদের অনুভূয়মান সত্তা ইহারই তরঙ্গ, বিবর্ত ইত্যাদি—মিথ্যা।

এই মহাসত্তাই অর্থ। ইনিই শিব। ইঁহাকে জাগাতে হয় না; কারণ, ইঁহার নিদ্রা নাই। ইঁনি সদা একভাবে বিরাজমান। ইঁহার উপলব্ধি করিতে হইলে আলোক চাই। এই আলোক নিজেকে নিজে প্রকাশিত করে ও ব্রহ্মকেও করে। ব্রহ্ম=মহাসত্তা, যার গর্ভে অনন্ত খণ্ডসত্তা আছে—তারাও প্রকাশিত হয়। কারণ, 'একেন বিজ্ঞাতেন সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'। এই আলোকই শক্তি বা কুণ্ডলিনী বা শব্দ (স্ফোট)। ইনিও নিত্য। ইঁহার দুই অবস্থা—

(a) অব্যক্ত (b) ব্যক্ত।

অব্যক্ত শক্তি বা শব্দ মহাসত্তাকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সে নিজে অপ্রকাশিত; সুতরাং অর্থ-ক্রিয়াসমর্থ নহে। অপরকে কি প্রকারে প্রকাশিত করিবে? ব্যক্তশক্তি পারে। ব্যক্তশক্তি শিবই, অথচ শিবের প্রাপক।

শক্তি যখন অব্যক্ত, তখন শক্তি যেমন নিষ্ক্রিয়, তেমনি মহাসত্তাও অসৎ। অর্থাৎ চিদংশ যখন অব্যক্ত, তখন সদংশও অপ্রকাশমান, অবিদ্যমান, অজ্ঞায়মান—অসৎ। অব্যক্ত চিৎ=অচিৎ। অতএব যাহা অচিৎ তাহাই অসৎ। চিৎ জাগিলেই সতের প্রকাশ হইবে। অতএব নিষ্ক্রিয় শক্তিই জড়ত্ব, তমঃ। সক্রিয় শক্তিই জড়ত্বের বিনাশ, তমোনোদন বা রজঃ। উদ্বুদ্ধশক্তিই চৈতন্য, সত্ত্ব, প্রকাশ, স্বয়ম্ভূ, শিব। তাই জড়ত্ব=অসৎ।

শক্তির জাগরণ=শক্তির শিবভাবাপত্তি, শিবের সঙ্গে মিলন—ইহাই শৃঙ্গার বা আনন্দ।

স্ফোট যতক্ষণ অব্যক্ত, ততক্ষণ অর্থপ্রকাশ হয় না। নাদের দ্বারা স্ফোট অভিব্যক্ত হয়—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রকাশ হয়। স্ফোটের পূর্ণাভিব্যক্তি =পরমার্থের প্রকাশ। সে অবস্থা কি?

বৈষম্য, বাক্ ও অর্থ=পরস্পর সংসৃষ্ট—ইহাই বিচিত্র রস বা আনন্দ।

সাম্য, বাক্ ও অর্থ=পরস্পর বিবিক্ত—ইহাই সমরস বা সাম্য।

৯/১০/২৫

সূর্য=বিবস্বান্।

১। সূর্য হ'তে উৎপন্ন হন যিনি, তিনি বৈবস্বত। সে কে? বৈবস্বত= যম=কাল=অগ্নি=রুদ্র (কালাগ্নি-রুদ্র)। 'কালঃ পচতি ভূতানি' এই স্থলে জানা যায় যে, কাল অগ্নিস্বরূপ। ইনি সংহারকারক রুদ্র। ইনি জগতের পরিণামসাধক।

২। আবার সূর্য হ'তে উৎপন্ন হন সোম বা চন্দ্র। তাই সূর্য=সবিতা, সোম=সূত। ইঁনি জলস্বরূপ। ইঁনি সৃষ্টিসাধক।

মধ্যে স্থিতিরূপ স্বয়ং। ইঁনি বিষ্ণু বা নারায়ণ।

৩০/১০/২৫

গুণাতীত	১। পূর্ণবস্তু
সত্ত্ব	২। পুরুষ
রজঃ	৩। প্রকৃতি
তমঃ	৪। অবিদ্যা
কার্য	৫। বিকার

(১) হইতে (২) বাহির হয়। তখন প্রকৃতি নাই। ইহা অদ্বৈতসৃষ্টি। পরমহংস পদ। কৌমার ভাব। জ্ঞানপ্রাধান্য। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, স্থির। পূর্ণ-বস্তুর সঙ্গে পুরুষের সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় প্রকৃতি। বাহির হয় পুরুষ হ'তে। পূর্ণবস্তু ও পুরুষের মধ্যে পুরুষ গর্ভধারক। প্রকৃতির আবির্ভাব পুরুষ হইতে।

পুরুষ ও প্রকৃতিতে সংঘর্ষ (মৈথুন) হয়। তা' হ'তে অবিদ্যার উদয় হয়। প্রকৃতি চঞ্চলা। পুরুষ স্থির। উভয়ের সংঘর্ষে অবিদ্যা জন্মে। পুরুষ প্রকৃতির মোহে মোহিত—বদ্ধ। এই মোহিত পুরুষই অবিদ্যা।

প্রকৃতি ও অবিদ্যাতে সংঘর্ষ হ'লেই যাবতীয় বিকারের উৎপত্তি হয়।

৮/১১/২৫

পুরুষকার—পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি।

দৈব —নিয়তি, প্রকৃতি।

পুরুষ যখন দ্রষ্টা হইয়া যায় তখন তাহার ক্রিয়াই লীলা—সে ক্রিয়াতে বাধা হয় না, বন্ধন নাই। তাহা দৈবের অধীন নহে।

পুরুষ যখন মোহিত, তখন সে প্রকৃতির অধীন; প্রকৃতির দ্বারা চালিত, বদ্ধ—প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়নক। এইটি দৈবের রাজ্য। বদ্ধপুরুষ যতক্ষণ বদ্ধ আছে, ততক্ষণ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। এমন কি, তাহার বর্তমান কর্মও দৈবাধীন।

২/১২/২৫

মন =শক্তি; আত্মা=শক্তিমান্।

মন যখন সমসূত্রে আত্মার সহিত মিলিত হয়, তখন অদ্বৈতাবস্থা—সামরস্য। তাতে চৈতন্য-স্ফূর্তি থাকে, মনের লয় হয় না। তখন মন

আত্মাকার। তখন মনঃ চৈতন্যময়। ইচ্ছা হইলেই মনঃ বাহির হইতে পারে—অথচ বাহির হইলেও তাহাকে আট্‌কাইবার কেহ নাই। মন আত্মার সমকক্ষ, তুল্যবল না হইয়া মিলিলে এ অবস্থা হ'তে পারে না। সমবল মল্ল যেমন কাহাকেও অভিভূত করিতে পারে না, তদ্রূপ। ইহাই স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু মনের বল যদি কম থাকে, আর তখন যদি আত্মার সহিত মিলন হয়, তা হ'লে মন অভিভূত হ'য়ে যায়। প্রবলের সঙ্গে দুর্বল মিলিতে গেলে এই দশাই হ'য়ে থাকে। ইহা চৈতন্যহীন জড়াবস্থা। ইহা নির্বাণ বা মোক্ষ।

সুতরাং নির্বাণকে এড়াইতে হ'লে মনের সবলতা সম্পাদন আবশ্যক। সেইজন্যই শক্তি-উপাসনা। যে অনুপাতে মনঃ শক্তিমান্ হবে, সেই অনুপাতে সে আত্মার সহিত সমসূত্রে মিলিতে পারিবে। শক্তির ক্রমিক বৃদ্ধির সহিত মিলনের গভীরতা সম্পন্ন হয়। তাই সাম্য-অবস্থাতেও নিত্যক্রম আছে। চৈতন্যই শক্তি। আনন্দই মিলন। স্বভাবই আত্মা। জীবই মন। চৈতন্য বা শক্তির সঞ্চারমাত্রই এই সাম্যের উদয় হয়। তাই শান্তভাব। এই সঞ্চার না হ'লে মন বলহীন;—সে অবস্থায় আত্মলাভ হয় না।

আত্মার সহিত যথার্থ সাম্য একমাত্র মহাশক্তির—উভয় তুল্যবল, সমরস। মন মহাশক্তি হ'তে উদ্ভূত। মন যতটা মহাশক্তির সমীপবর্তী হয়, ততটা অধিক রসের আস্বাদন হয়। মহাশক্তি নিত্য সর্বরসের আধার—মাধুর্য্যখনি। মহাশক্তির দিকে গেলে মনের প্রসার হয়—ক্রমশঃ চৈতন্য-বিকাশ হয়। মহাশক্তির দিকে না যাইয়া, সোজা আত্মায় গেলে নির্বাণ হয়। সোজা আত্মায় যাওয়া মানে বিষয়-ত্যাগ। বিষয়-ত্যাগমাত্রই মন আত্মায় লীন হয়—শূন্যে লয়, জড়ত্ব। তাই চৈতন্য ধরিয়া তবে বিষয় ছাড়িতে হয়—তা হ'লে আর শূন্যে লয় হয় না। গীতায় আছে—'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'। বিনা অবলম্বনে মন থাকে না। অতএব চৈতন্য সঞ্চার হ'লেই মন নিত্য অবলম্বন পায়, নিরাশ্রয় থাকে না। তাই আশ্রিতভাবলাভই চৈতন্য-সঞ্চার। মহাশক্তি অবশ্য নিরাশ্রয়, স্বয়ং তিনি মনের আশ্রয়। তাই তাঁর কোলে বসিয়া মন আত্মার রস গ্রহণ করে; স্বাচ্ছন্দ্য পায়। মাকে না ধরিলে জ্ঞান-ভক্তি কিছুই হবার জো নাই।

৮/১২/২৫

অভেদ-বোধ ও ভেদ-বোধ।

মূল=কেন্দ্র, বিন্দু। চারিদিকে অসংখ্য বিন্দু আছে। যখন সেগুলি কেন্দ্রমুখীন, তখন তাদের অস্তিত্ব জানা যায় না। ইহাই অদ্বৈতভাব—অভেদ। যখন সেগুলি বহির্মুখীন, তখনই তাদের পার্থক্য বুঝা যায়। তাহা সৃষ্টির

অন্তর্গত হ'ল—দ্বৈত হ'ল। নিজের সত্তা বুঝিলেই তাঁহা হ'তে ভেদ আছে—মানিতে হইবে। শুধু তা'তে লক্ষ্য থাকিলে নিজের স্মৃতি থাকে না—সত্তাও থাকে না। আপনহারা ভাব। মগ্নভাব—সাম্য।

ভাসিয়া উঠিলেই বৈষম্য—নিজত্ব, বহুত্ব, সৃষ্টি। ভাসায় কে? ডোবায় কে?

১৬/১২/২৫

জগতের যাবতীয় রূপই ভোগ্য—তাই চন্দ্র-কলাত্মক। কেউ ইহার ভোক্তা আছে। এই ভোগ হয় বলিয়াই রূপের বিকার হয়—ক্ষয় আছে। ভোক্তা সূর্য-মণ্ডলস্থ অগ্নিতত্ত্ব।

এই অগ্নিই কালাগ্নি বা রুদ্র। ইহা হ'তেই সংহার হয়। এই কালরূপী অগ্নিই বিকার-সম্পাদক।

যেখানে চন্দ্রকলা আছে, অথচ কাল নাই, অগ্নি নাই—সেখানে বিকার নাই, ক্ষয় নাই। সে কলা নিত্যকলা; তাই ষোড়শী—বা নিত্যা, অমৃতা কলা। তার রূপাদি অক্ষয়, অবিকারী।

ষোড়শীর কেহ ভোক্তা নাই। তাই ষোড়শী কুমারী।

যে পর্যন্ত ভোগ আছে সে পর্যন্ত প্রকৃতি-পুরুষভাব আছে। বিরোধ আছে— দ্বন্দ্ব আছে। তার ঊর্ধ্বে ভোগ নাই, দ্বৈত নাই।

জ্ঞানে অজ্ঞান কিছু আছেই। অজ্ঞানেও জ্ঞান কিছু আছেই। উভয়ে বিরোধ আছে—অথচ উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনও আছে। এই বিরোধ ও মৈত্রী যুগপৎ স্থায়ী। কারণ, এক অপর হ'তে বড় হ'তে চায়। এই চাওয়া আছে ব'লে সে বড় হয়—সম্বন্ধে থাকে, অপর ছোট হয়। যখন চাওয়া থাকে না, তখন সম্বন্ধ থাকে না। বিবেক আসে। তখন দুই-ই সমান হ'য়ে যায়। কেউ বড় নয় বা ছোট নয়। তখন মাঝখানকার ফাঁকা রাস্তা প্রকাশিত হয়। মহাশক্তি উদ্বুদ্ধ হন। মহাশক্তির কাছে জ্ঞান-অজ্ঞান সমান; কারণ, তিনি মধ্যস্থ, সাম্য-রূপা—সেখানেই দর্শক হওয়া যায়। তিনি অ-জ্ঞানকে জানেন। জ্ঞান অজ্ঞানকে জান্‌তে পারে না—অ-জ্ঞানকে বিষয় করিতে গেলেই অজ্ঞান থাকে না। আলো দিয়া অন্ধকার খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

২৩/১২/২৫

প্রকৃতি স্বয়ং দিব্য—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক—দেহ বিকশিত করেন। ক্রমঃ—

১। জড়—তমঃ

২। সত্ত্বস্ফুরণ—জীবভাবলাভ, প্রথমাবস্থা।

[জীব দেহ ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় সূক্ষ্ম স্থূলের সারটি লইয়া চলে। এইভাবে

৩। অধিকতর স্ফুরণ—জীবের উন্নত স্তর লাভ।

× ×

× ×

[মানবদেহে অন্য সব দেহের সারাংশ আছে। দিব্যদেহে যাবতীয় সত্ত্বের সমষ্টি আছে —অথচ অখণ্ড।]

৪। মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব

এই পর্যন্ত আরোহ-প্রণালীতে অবাধিতভাবে উঠে।

এখানে কর্মরাজ্য—চার দিকের রাস্তা খোলে। যদি কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির প্রেরণায় চলে পুরুষকার ছাড়িবার পুরুষকার করে, তবে আবার প্রাকৃতিক বিকাশ আরম্ভ হয়। ফলে,—

৫। দেবত্ব দেবত্ব

=শুদ্ধসত্ত্ব

নতুবা প্রলয়, মোক্ষ, নির্বাণ—অথবা নিত্যসংসার।

২৪/১২/২৫

নিত্যলীলা ইতিহাসের বিষয় নহে। কারণ, ইহা দেশ ও কালের উপরে। সদাই একটা ভাবস্ফুরণাত্মক আনন্দ-উচ্ছ্বাস চল্‌ছে—সেখানে দেশকালের বোধ নাই। অথচ **বোধ** আছে। তাই ইহা মায়াতীত চৈতন্য। সাক্ষী তার দ্রষ্টা। সে লীলাতে সকলে আত্মহারা। আত্মবোধ সেখানে থাকতে পারে না—কারণ, সেটা উন্মাদস্তর। বোধ আছে, কিন্তু আত্মবোধ নাই। কি যেন একটা মহাভাবে সদা মগ্নতা। ইহা জ্ঞানাতীত অ-জ্ঞান।

ঈশ্বর ঐ লীলার **ভোক্তা** এবং অধোদেশে সঞ্চারকর্তা।

অব্যক্ত যে কোথায় তাহার ঠিক নাই। দুই-ই এক। আলো আর আঁধার। আলো বেশী হ'লে আঁধার মিশে যায় তাতে, আঁধার বেশী হ'লে আলো তাতে মিশে যায়। যে বেশী সে-ই আত্মপ্রকাশ করে। মূলে উভয়েই এক। একভাব—ফাঁকে সাক্ষী।

জীব যতক্ষণ ঘোরে, ততক্ষণ।

২৬/১২/২৫

সত্ত্ব = A (প্রধান), a (অপ্রধান)

রজঃ = B, „ b→ „

তমঃ = C, „ c→ „

Abc, Bca, Cab, ABc, BCa, CAb, $\frac{ABC}{abc}$ (ABC = abc)

২৮/১২/২৫

একটি জিনিস যদি রৌদ্রে ধরা যায়, তার ছায়া পাওয়া যাবে। যদি ঐ জিনিস ক্রমশঃ সূর্যের দিকে নেওয়া যায়, তবে ছায়া ছড়াবে—শেষে আর তা দেখা যাবে না, আলোতে বিলীন হবে। যদি জিনিসটি সূর্যগত হয় তবে যেখানে যেখানে সূর্যের আলো আছে—সর্বত্রই জিনিসের ছায়াও থাক্‌বে—কিন্তু দেখা যাবে না। অতএব সূর্যে যা কিছু আছে তা সূর্যের আলোতে আছে।

ঐ জিনিস = ক

উহার ছায়া = ক১

সূর্য = ○ বা বিন্দু

সূর্যপ্রভা = প্রভা বা চক্র।

প্রকৃতস্থলে ক = সূক্ষ্ম বা আত্মা।

ক১ = স্থূল।

'ক' 'খ' প্রভৃতি সবই সূর্যে আছে—সূর্যবৎ, সমভাবে—ক১ খ১ প্রভৃতি সবই সূর্যপ্রভায় পাওয়া যায়—আছে। 'ক' নামিলেই ক১ ঘনীভূত হয়, সমগ্র প্রভামণ্ডল হ'তে একখানে এসে জমে—সৃষ্টি হয়। জমিবার সময় অন্যান্য পরমাণুর ছায়া তার সাহায্য করে। এইটি 'ক'-র দেহবন্ধ ভাব। 'ক'-কে সূর্যের দিকে নিলে 'ক'-র দেহ লীন হইয়া যাইবে—ছড়াইয়া যাইবে।

যেখান পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ, সেখান হতে স্থূল বা ছায়া আরম্ভ। তার উপরে বিশুদ্ধ সূক্ষ্মভাব। পৃথিবী = স্থূল। মাধ্যাকর্ষণ-সীমা পর্যন্ত পৃথিবী। 'ক'-তে নামিতে নামিতে সেই স্তরে পড়িলেই ছায়া বিকীর্ণ করিবে। সেই স্তরের উপরে 'ক'-র ছায়া নাই। ছায়া নাই কিন্তু আলো বিকীর্ণ করে। অর্থাৎ 'ক'-র দেহ সূক্ষ্ম—জ্যোতির্ময়, দিব্য—তাও আলোরূপে সূর্যপ্রভায় ছড়ান আছে।

মাধ্যাকর্ষণের সীমা পর্যন্ত ভূতাকাশ (= ব্যোম); উপরে চিদাকাশ (= মহাব্যোম, পরব্যোম)।

ভূতাকাশ পর্যন্ত সংসার-চক্র। কারণ, স্থূল সম্বন্ধ আছে। তদুপরি বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম জগৎ।

'ক' যখন নামে স্থূল হওয়ার জন্য, একটি line ধরিয়া নামে। নতুবা মিশ্রণ হ'লে প্রকাশ বা স্থূলত্ব হয় না। সৃষ্টি হয় না। শুধু ছায়া-রঙ্গে সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব (= 'ক') চাই। ছায়াটি বিকার। সত্ত্ব বা গুণ বা প্রকৃতি = উপাদান।

২৯/১২/২৫

যখন কোন জিনিসকে দগ্ধ বা নষ্ট করা হয়, তখন উহার spirit, যাহা অদাহ্য—দেহমুক্ত হইয়া স্বভাবতঃ উড়িয়া ঊর্ধ্বে চলিয়া যায়। যেখানে ঐ spirit-রাশি আছে—সেখানে যাইয়া মিশে। উহা মাধ্যাকর্ষণ জগতে ছিল, শুধু দেহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া।

আবার ঐ spirit-কে নামাইলে তার পূর্ব-দেহ গঠিত হইবে। এতদিন তাহার দেহের পরমাণু বিশ্বময় ছড়াইয়া ছিল। সব জিনিসে মিশিয়া ছিল। যাতে ছিল তাই হইয়া—অপৃথক্‌ভাবে—ছিল। তাদের প্রাবল্য ছিল না। spirit নামিলে তার দেহের particle-গুলি সর্বস্থান হ'তে আবার আসিয়া একত্র হইবে এবং ঠিক পূর্বভাবে সম্মিলিত হইবে। Order-এর change হবে না।

তবে একটি কথা আছে। spirit body গঠিত হওয়ার পরে উহা নামিবা-মাত্র natural body তৈয়ার হবে। কারণ দেহ সিদ্ধ হয়েছে—স্থূলকণার পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

Spirit body দ্বিবিধঃ—

১। যখন উহাতে স্থূলকণাভাস থাকে।

২। ,, ,, ,, থাকে না।

প্রথমটি লিঙ্গশরীর বা Astral body; দ্বিতীয়টি দিব্যদেহ; কিন্তু ইহা প্রায় চলে না। লিঙ্গশরীর হ'তে স্থূল সরাইবার সময় লিঙ্গকণা আপনি সরিয়া যায়। ফলে নির্বাণ হয়। যদি লিঙ্গকে জমাইয়া নেওয়া যায়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে স্থূলকে সরান যায়—তবে স্থূল সরিয়া গেলেও ঘনীভূত লিঙ্গ থাকে। লিঙ্গ লীন হয় না। এই লিঙ্গ আর পারিভাষিক লিঙ্গ নহে—ইহা দিব্যদেহ।

এই জমান অনেক প্রণালীতে হ'তে পারে। ভাব ও তদ্‌বিষয়ানুসারে তার shape ঠিক হয়। ভাব যেমন, লিঙ্গ তদাকার প্রাপ্ত হয়। ভাব জমিয়া গেলে, স্থূল শূন্য হ'লে, ভাবমধ্যে foreign matter না থাকিলে, ভাব শুদ্ধ হ'লে—ভাবদেহ বিকশিত হয়। উহা নিত্য, একরস, চিন্ময়।

২/১/১৯২৬

(১)

মৃত্যু একটি ভীষণ আঘাত। সেই আঘাতে স্থূলদেহের পাত হয়—লিঙ্গের সহিত স্থূলের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। মৃত্যু = অ-জ্ঞান।

মহামৃত্যু আরও ভয়ানক আঘাত। তাতে লিঙ্গের সহিত সূক্ষ্মের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। মহামৃত্যু = জ্ঞান।

কিন্তু একটি কথা আছে। স্থূল ত্যাগ হয় বটে, কিন্তু লিঙ্গে স্থূলাভাস থাকে বলিয়া আবার স্থূলে অবতরণ হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা এই স্থূলাভাস কাটে।

তদ্রূপ লিঙ্গ-ত্যাগ হইলেও সূক্ষ্মে লিঙ্গাভাস থাকে। তাই আবার সূক্ষ্ম হ'তে লিঙ্গে নামিবার ভয় রহিল। সূক্ষ্মাবস্থায় জ্ঞান পূর্ণমাত্রায়ই আছে। কিন্তু তাতে লিঙ্গনিবৃত্তি হয় না। ভক্তি ভিন্ন এই লিঙ্গাভাস কাটে না।

সুতরাং ভক্তিতেই আত্মা সূক্ষ্ম লিঙ্গবর্জিত হ'তে পারে। তখন সূক্ষ্ম = বিশুদ্ধ, খাঁটি। লিঙ্গ থাকিলেই প্রয়োজন থাকিল। অভাব থাকিল। জ্ঞানেও অভাব মিটে না।

আসল কথা—নীচের টান অভিভূত করিতে হইলে উপরের সদাকালীন প্রবলতম টান চাই। তাই ভক্তি। তখন আর নীচের টান কাজ করে না বলিয়া পতন হয় না।

(২)

সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘোরে। আত্মা স্থির, লিঙ্গ ঘোরে। লিঙ্গ পশ্চিম হ'তে পূর্বে সূর্যকে প্রদক্ষিণপূর্বক যাইতেছে। তাই মনে হচ্ছে—সূর্য পূর্ব হ'তে পশ্চিমে যাচ্ছে। যেখানে উদয়, তার সমসূত্র বিপরীত দিকে অস্ত—অর্থাৎ ১৮০° দূরে। বস্তুমাত্রেরই স্থিতিকাল ১৮০°। তারপরটা অব্যক্ত—ইহাই অর্ধচন্দ্র বা নাদ। বিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) স্থির।

আয়ুঃ জানিবার ইহাই উপায়। যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তার duration নিরূপণের ইহাই উপায়।

পূর্বে যাওয়া = সামনে যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া। সকল বস্তুই সম্মুখের দিকে যাইতেছে—অথচ একটি বিন্দুকে দক্ষিণে রাখিয়া। বিন্দুটি স্থির বলিয়া এই মার্গটি অর্ধবৃত্তাকার।

কথা একই।

যাহা চাই, তাই আমার বিন্দু। তাকেই প্রদক্ষিণ করছি—নিরন্তর করছি। যা চাই—মূল শুদ্ধবিন্দুই তদাকারে প্রকাশ পাচ্ছে।

সুতরাং আমরা বস্তুকে (আত্মাকেই) প্রদক্ষিণ করছি, কামনাবশতঃ কাম্য-বস্তুকে করছি।

যেখানে উদয় তার ৯০° পরেই পূর্ণ প্রকাশ—ক্রমে হ্রাস।

ঠিক মধ্যাহ্নেই তাই সূর্যের আপন রূপের কতকটা আভাস পাওয়া যায়, সকালে বা বৈকালে নহে। কারণ, তখন গতিচক্র।

যে কোন সময়ে আগুনের focuss করিবে, ঐ মধ্যাহ্ন-সূর্যই পাওয়া যাবে।

৪/১/২৬

যখন কিছু হ'তে আলো বিকিরণ হচ্ছে, তখন হ'তে সৃষ্টি আরম্ভ। সৃষ্টির মধ্যে সব বস্তুরই বিকিরণ আছে। বিন্দু যদি শুধু বিন্দু থাকে, তবে সৃষ্টি নাই। তার প্রকাশ নাই—যদিও তা স্বপ্রকাশ। বিন্দু চক্রেরই বিন্দু। বিন্দুই ফাঁক—শূন্য। তাই যেখানে সিন্ধু, তাহা পরব্রহ্ম।

বিন্দুর প্রকাশ-কালকে আনে কম্পন বা কালশক্তি। বিন্দু ত' কালের উপর, তবে কাল তাকে স্পর্শ করে—কেমনে?

যে আলো ছড়ায় না, তা দ্বারা কিছু দেখা যায় না। তা শুধু নিজেই থাকে। যার উপর ফেল, তা দেখা যাবে না। শুধু সে আলোই দেখা যাবে। চারিদিকে শূন্য হইয়া যায়। মহাশূন্য। নতুবা ঘনীভূত আলো দৃশ্য হয় না।

৫/১/২৬

যেখান হইতে সৃষ্টি হয় সেখানে লয় হয় না।

অতীত ও অনাগত এক নহে।

কাঠে অগ্নি আছে—সেই অগ্নি সুপ্ত, নিষ্ক্রিয়। কাঠে চাপা আছে। যখন ঘর্ষণাদি দ্বারা তাহা জাগিবে তখন কার্য করিবে—অর্থাৎ কাঠকে ভস্ম করিবে ও জাগ্রৎ অগ্নি মহাজাগ্রৎ অগ্নিরাশিতে যাইয়া মিলিবে। পুনর্বার সুপ্ত হইবে না। তবে একটি কথা আছে। উহাকে—জাগ্রৎ অগ্নিকে—আবার নামান যায়। নামিলে সঙ্গে সঙ্গে কাঠ উৎপন্ন হইবে। সুতরাং জাগ্রৎ অগ্নিতেও কাঠের অংশ ছিল। সব সুপ্ত অগ্নিই জাগিলে মহাজাগ্রৎ অগ্নিতে যায় বটে, তবে তাতে কাষ্ঠাদির অংশ থাকে। যদি না থাকিত, তবে তা সৃষ্ট হইত না।

৭/১/২৬

জড় = পাতাল
জীব = ভূ, মর্ত্য
ঈশ্বর, দেব = স্বর্গ

জীব ঈশ্বরের কণা, পাতালে আবদ্ধ আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে। জড়সম্বন্ধ ত্যাগ হ'লেই সে স্বর্গে যাবে। ধর, N = চৈতন্য, S = জড়।

N-এর সঙ্গে S-এর যোগে S-এর গর্ভসঞ্চার হয়—ফলে, জীব জন্মায়।

জন্মিয়াই জীব উঠে—উঠে মানুষ পর্যন্ত। পরে পুরুষকার বিকশিত হয়। তখন তাহা ত্যাগে আবার উঠে—নতুবা ঘোরে, একভূমিতে থাকিয়াই। N ও S মিশেছে—যখন অক্ষরেখা অনন্তস্থ, অর্থাৎ বৃত্তাকার। তখন N ও S একই বিন্দু। কল্পনায় দুই। তখনই জীবসৃষ্টি। অনন্ত হ'তে জীবসৃষ্টি হয়। মূলে কল্পনা—যাতে N ও S দুই হয়, বৃত্ত সরলরেখায় পরিণত হয়।

N বা ঊর্ধ্ববিন্দুর উদ্‌গমনের শেষ নাই—যত উঠিবে ততই উঠিতে পারে। আবার অনন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হ'লেই, কল্পনাত্যাগেই, ঊর্ধ্বগমন থাকে না। তখন ঊর্ধ্ব ও অধোবিন্দু এক হয়, সরলরেখা বক্র হয়। ফলতঃ বিন্দু চক্রের কেন্দ্র হইয়া যায়—যেখানে N ও S একাকার। এটাই লীলাচক্র। অনন্ত ভিন্ন লীলাচক্র প্রকাশ নাই। বিন্দু স্থির যদিও। লীলামণ্ডলের বাহিরে বৃত্ত নাই। সরলরেখা। ঊর্ধ্ববিন্দু=ঈশ্বর। এ ঐশ্বর্য্য আপেক্ষিক। কারণ, N-এর উদ্‌গতির সীমা নাই। অথচ ঊর্ধ্ববিন্দু=জীব।

১১/১/২৬

বাহির না হ'লে কেউ কাহাকেও দেখতে পায় না—ইন্দ্রিয় দ্বারা বা ইন্দ্রিয়-ভাবিত মন দ্বারা। সূর্য দৃশ্য, সুতরাং ইনি বাহ্য। ইনি বাহির হচ্ছেন, কিরণ-রূপে বিকীর্ণ হচ্ছেন, রশ্মিরূপে ছড়াচ্ছেন। নতুবা ইন্দ্রিয়গোচর হতেন না। বস্তুতঃ সূর্য (=সূক্ষ্ম), যেখানে বিকিরণ নাই,—দৃশ্য নহেন। সেখানে তিনি স্বপ্রকাশ আত্মা। যখন সূর্য দৃশ্য, তখন দ্রষ্টা লিঙ্গাত্মা—শুদ্ধাত্মা উভয়ের সাক্ষী, তাহাই পরমাত্মা।

প্রকৃত সূর্য=আত্মা।

তার সংলগ্ন একটা স্তর আছে—তাহা শুদ্ধসত্ত্ব। তাহার বাহিরে মিশ্র-সত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব একরস, সদা যুক্ত—সেখানে বিকিরণ নাই। মিশ্রসত্ত্ব একানেক—ঊর্ধ্বমুখে একমুখ, নিম্নমুখে বহুমুখ। একমুখে তেজঃ গ্রহণ করছেন, নিরন্তর—অপর মুখে ছড়াচ্ছেন। এই বহুমুখতা রজঃবশতঃ। বাহির হ'য়ে যেখানে তেজের লয় হয়—তাহা তমঃ।

মিশ্রসত্ত্ব ভেদ না করিলে যাহা দৃশ্য, তাহা প্রকৃত সূর্য নহে—ছায়া মাত্র। এই মিশ্রসত্ত্ব না থাকিলে জগতের ধ্বংস হইয়া যাইত।

১৩/১/২৬

অসীমে বিরোধ নাই। সীমা হইলেই দুইটি শক্তিতে বিরোধ থাকিবে। অন্তর্মুখ, বহির্মুখ; কেন্দ্রমুখ, বাহ্যমুখ; বিদ্যা-অবিদ্যা। ভাল-মন্দ; ছোট-বড় ইত্যাদি।

এই বিরোধই বৈষম্য। যেখানে সীমা—সেখানেই উভয় প্রান্ত-ভেদেই অসীম। অণু = একপ্রান্ত, মহৎ = অপর প্রান্ত—তার অতীত = অসীম। সীমা-বন্ধ মানে মধ্যম পরিমাণ—অর্থাৎ অণু হইতে মহৎ পর্যন্ত। ইহা ব্যক্ত। অসীম = অব্যক্ত।

সঙ্কোচের সীমা অণু, প্রসারের সীমা মহৎ—অতীত হইলেই অসীম, সেখানে সঙ্কোচও নাই, প্রসারও নাই। ইহাই শ্বাস-প্রশ্বাস, যাতায়াত, প্রাণা-পান-ক্রিয়া, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য—ইত্যাদি যাবতীয় দ্বৈত।

প্রত্যেক বস্তুতেই তাই বিরুদ্ধশক্তি খেলছে। একদিকে ঝোঁক পড়লেই অপরদিক্ হাল্কা হয়। যেদিকে ঝোঁকে, সেদিকে ভারকেন্দ্রী হ'ল।

১৭/১/২৬

সূর্যবিজ্ঞান

কারণ ব্যাপার দ্বারা অব্যক্ত কার্যের ব্যঞ্জনা হয়। কারণব্যাপার = উপাদান-নিমিত্তাদির ব্যাপার। কারণ যখন নিষ্ক্রিয়—অথবা সদৃশ পরিণামবিশিষ্ট মাত্র —তখন কার্য অব্যক্ত। কারণ মানে ত গুণই ধর, আর ৫ ভূতই ধর—যখন তাহা নিষ্ক্রিয়, তখন কার্য অব্যক্ত। কার্যকে ব্যক্ত করিতে হইলে কারণকে ক্ষুব্ধ করিতে হইবে—বিসদৃশ পরিণামযুক্ত করিতে হইবে। চিৎ-শক্তির সঞ্চার ভিন্ন তাহা হয় না। অর্থাৎ কারণরাশিতে চিৎ-শক্তির সঞ্চার হইলেই ঐ কারণই ব্যাপৃত হইয়া বিসদৃশ পরিণাম লাভ করে। তাই সৃষ্টি হয়।

চিৎ-শক্তির সঞ্চার ত' কার্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে আবশ্যক। কার্যভেদের নিয়ামক কে? মূল কারণ সমভাবাপন্ন। তা' ক্ষুব্ধ হ'বে চিৎ-শক্তির অনু-প্রবেশে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষুব্ধ হবে কেন?

ব্যাপক বা স্বরূপ-চৈতন্যের অনুপ্রবেশ হয় না। আংশিক চৈতন্যের বা চৈতন্যশক্তির হ'তে পারে। আংশিক চৈতন্য বহু ও পরস্পর পৃথক্। এই বহুত্ব ও পার্থক্যের মূল লিঙ্গভেদ বা সত্ত্বভেদ।

এই বিভিন্ন বহু সত্ত্বে—চৈতন্যাংশ এক, লিঙ্গাংশ বহু।

এই বহুসত্ত্ব অখণ্ড সত্ত্বের অংশ। সেখান হইতে অখণ্ডসত্ত্বের প্রেরণায় উহা কারণসমুদ্রে পতিত হয়। কারণসমুদ্র = তমোরাশি বা ত্রিগুণপ্রকৃতি।

কারণসমুদ্রই জড়স্তর। খণ্ডসত্ত্বও অনাদি। ইহাই জীব। অখণ্ডসত্ত্বই ঈশ্বরোপাধি।

অখণ্ডসত্ত্বে খণ্ডসত্ত্বরাশি মগ্ন থাকে। যখন এক একটি বাহির হয়, তখন খণ্ডাংশ চ্যুত হইয়াই পড়ে—কিন্তু অখণ্ডসত্ত্বের এক রেখা—অচ্ছিন্ন ধারা—

তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধারার অধোবিন্দুই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। যখন জীব নামে, এক হিসাবে পরমাত্মাও তার সঙ্গে সঙ্গে নামে। এই রেখা চির-দিন, ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, বজায় থাকে।

জড়স্তরে জীব বা সত্ত্বাংশ অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই কারণে চিৎ-শক্তির সঞ্চার। তা' হ'লেই দেহ গঠিত হয়, স্থূলবস্তু নির্মিত হয়।

ধর একটি গোলাপ। ইহা একপ্রকার সত্ত্ব। মূলসত্ত্ব অখণ্ড। প্রথমে তার বিকাশ চাই—তার কোলে বিশিষ্ট খণ্ডসত্ত্বের বিকাশ চাই। এই সত্ত্বাংশ বহির্গত হইলেই—অর্থাৎ জড়স্তরে পড়িলেই—স্থূলাবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়িবে। তাহাই গোলাপ-সৃষ্টি। এই সত্ত্বাংশ অব্যক্ত, গোলাপরূপ কার্য। তত্তৎ রঙের সমাবেশ মানে এই সত্ত্বাংশের প্রাকট্য। ঐ বিশিষ্ট সমাবেশ না হওয়া পর্যন্ত সত্ত্বাংশ অব্যক্ত, অপ্রকট। ঐরূপ সমাবেশ হইলেই সত্ত্বাংশ বাহির হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম স্থূল হয়, অব্যক্ত ব্যক্ত হয়। রং শুধু ব্যঞ্জনা মাত্র।

ইচ্ছাশক্তি ও বিজ্ঞানে এই প্রভেদ যে, বিজ্ঞান সূর্যরশ্মি বা রং হইতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রঙের সমাবেশ করিয়া দেয়। ঐ ভিন্ন রং বাহিরে আছে। সমাবেশ যে প্রকার হয়, তদনুরূপ সত্ত্বাংশ স্থূলতা লাভ করে, ব্যক্ত হয়। সত্ত্বাংশ বাহিরে আসে, প্রকাশ পায়।

ইচ্ছাশক্তিতে বিপরীত ক্রম। সত্ত্বাংশ যে অখণ্ডসত্ত্বে গ্রথিত আছে, সেই অখণ্ডসত্ত্ব হইতে ধাক্কা দিয়া সত্ত্বাংশকে বাহির করিয়া দিতে হয়। এই ধাক্কাটি অখণ্ডসত্ত্বের আপন ব্যাপার। ভিতর হ'তে এই ধাক্কা পাইলেই সত্ত্বাংশ বাহির হয়—তখন অনুরূপ বর্ণসমাবেশ আপনিই হইয়া যায়। যে যে বর্ণের সমাবেশে যে সত্ত্ব ব্যক্ত হয়, সে সে বর্ণ ঐ সত্ত্বের আন্তর্য্য নিবন্ধন আসিয়া জোটে। এই স্থলে ধাক্কা দিতে হইলেই জীবকে অখণ্ডসত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে হয়। পরে ধাক্কা। যুক্ত হওয়ার পূর্বে ইচ্ছা থাকে। তাই যোগান্তে উহা অনুরূপ প্রেরণা-রূপে সত্ত্বাধান করে। ইহার ফলেই সৃষ্টি হয়।

ইচ্ছা বা কামনাসহকারে অখণ্ডসত্ত্বে যুক্ত হইলে অখণ্ডসত্ত্বে আট্‌কাইয়া থাকিবার ব্যাঘাত হয়,—ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়। অখণ্ডসত্ত্বের সেই আকর্ষণ, যাহা খণ্ডসত্ত্বকে আপন বক্ষে ধরিয়া রাখিবে, তাহা ফোটে না। কারণ, খণ্ডসত্ত্ব অখণ্ডের বুকে যাইতে চাহিলেও বাহিরে আসিতে চায়। তাই সেখানে থাকিতে পারে না। অখণ্ডকে দিয়া কোন স্বার্থসাধন করিবার ইহাই বিপদ্। প্রেম চাই, কাম দ্বারা কিছু হয় না। কাম বা ইচ্ছা নিয়া তাঁর কাছে যেতে নাই —কারণ, গেলেই ফল পেতে হবে—সৃষ্টিতে অবতরণ অত্যাবশ্যক। শালগ্রাম দিয়া বাটনা বাটা মূর্খতা।

জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। সে ইচ্ছা অজ্ঞানের ইচ্ছা বা স্বভাবের ইচ্ছা। তাতে ভোগ হয় ও পরে আর ইচ্ছার উদয় হয় না।

১৮/১/২৬

সূর্যমণ্ডল যখন দেখা যাচ্ছে তখন আমরা সে মণ্ডলের বাহিরে আছি। মণ্ডল বৃত্ত। ভিতরে থাকিলে শূন্যস্থররূপে মণ্ডল দৃশ্য হ'ত না। মণ্ডলে ঢুকলে বাড়ীঘর বা জীবাদি বা যা কিছু দেখা যেত তা সব স্বপ্রকাশ দেখাত। সেখানে যত স্তর আছে, সব স্বপ্রকাশ। বাহির হ'তে আলো আসে না।

এখন আমরা পৃথিবীতে আছি। এইরূপ আরও বহু পৃথিবী আছে। সবখানেই পৃথ্বীমণ্ডলেই থাকা যেতে পারে। কিন্তু কোন জায়গাই স্বপ্রকাশ নহে। বাহিরের আলো দরকার হয়।

সুতরাং যে স্তর দেখিতে কোন আলোর দরকার হয় না—নিজের আলোতেই সব জিনিস প্রকাশমান, সব বস্তু অন্যনিরপেক্ষ—তাহা চৈতন্যময় স্তর। অবশ্য এখানেও কেন্দ্রাধীনতা সব বিষয়েই আছে। তবে কথা এই—কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ পরস্পর যুক্ত। রেখাত্মক। বিচ্ছেদ নাই।

যেখানে এই বিচ্ছেদ আছে, সেখানে সব জিনিসই পরপ্রকাশ্য। ইহা জড়-জগৎ।

চৈতন্যজগতে মন, ইন্দ্রিয়, বাহ্য আলো কিছুরই দরকার হয় হয় না। জড়-জগতে হয়।

যে প্রকাশ যাবতীয় চিজ্জগতে ছড়াইয়া আছে—তাহার উদয়াস্ত নাই। জড়জগতের প্রকাশের উদয়াস্ত আছে।

প্রকাশের বাহ্য অবস্থা—

১। যে শুধু নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে, অপরকে পারে না। সেখানে অপর নাই—অর্থাৎ অপ্রকট।

২। যে নিজেকে প্রকাশ করে, অপরকেও করে। এই প্রকাশনে সঙ্কোচ-প্রসার আছে। তাই কখনও অপর প্রকট, কখনও অপ্রকট। স্বয়ং সদাই প্রকট।

৩। যে নিজেকে প্রকাশ করে, অপরকেও করে। এখানে সঙ্কোচ-প্রসার নাই বলিয়া নিজেও সদা প্রকট, অপরও সদা প্রকট।

৪। যে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং অপরকেও পারে না। অন্যের দ্বারা নিজে প্রকাশিত হয়। তখন অপরকে পারে।

৫। যে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, অপরকেও পারে না। অন্যদ্বারা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে প্রকাশ অপরে সঞ্চালন করিতে পারে না।

৬। যে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, অপরকেও পারে না। অপর দ্বারা নিজে প্রকাশিত হয়ও না।

৭। যে নিজে অপরের কাছে প্রকাশিত হয় না—অপরকে প্রকাশিত করে।

৮। যে নিজে নিজের কাছেও প্রকাশিত হয় না—কিন্তু অপরকে প্রকাশিত করে।

৯। যে নিজে নিজের কাছেও প্রকাশিত হয় না—অপরকেও করে না।

১৮/১/২৬

সূর্য একখানা স্বচ্ছ প্রতিফলক মাত্র।

ঊর্ধ্বে যে মহাবিন্দু আছে, তাতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র বিন্দু আছে। যথাঃ—ক, খ, গ ইত্যাদি। এগুলি মহাবিন্দুতে নিত্য লগ্ন, তার অংশ, অথচ নিত্য। ইহাই "অব্যাহত কলা"। মহাবিন্দুর প্রেরণায় এগুলি সূর্যে পড়ে—অর্থাৎ সূর্যে প্রতিফলিত হয়; রেখারূপে সূর্যে নামে। এই রেখা সরল ও বিচ্ছেদরহিত, অখণ্ড। ইহাকে "অংশু" বলিলাম। এইভাবে সব বিন্দুই—এমনকি, মহাবিন্দুরও—প্রতিফলন সূর্যে হইতেছে। মহাবিন্দু = মহাশক্তি। ইহা জ্যোতি বা চৈতন্যশক্তি। কলাও তাই, অংশুও তাই।

সূর্যের বাহিরদিকে একটা বায়ু ঘুরছে—তাকে কাম বলে। সেখানে একটা বহির্মুখ ঠেলা সদা জন্মাচ্ছে। ওখান হইতেই বক্রগতি আরম্ভ। সূর্যের রশ্মি বক্রভাবাপন্ন। অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশাত্মক, উদয়াস্তময়—যথা,......। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, উন্মেষ-নিমেষ, উত্থান-পতন, আবির্ভাব-তিরোভাব ইত্যাদিময়, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বিন্দুসমষ্টি। তাই মিশ্রণ হয়। কারণ, মাঝে মাঝে শূন্য বা ফাঁক আছে, সেখানে বিজাতীয় বিন্দুর সমাগম হয়। জড়জগতের যাবতীয় বস্তুই এইরূপ মিশ্রিত—সচ্ছিদ্র।

সূর্যের ওপারে আলো বিকীর্ণ হয় না। কলামাত্রই অন্তর্মুখ, তাই বিলীন—পৃথক্‌তা অব্যক্ত। কিন্তু পার্থক্য আছে,—জড়সম্বন্ধ হ'লেই তাহার অভিব্যক্তি হয়।

সূর্যের এপারে বিকিরণ নিরন্তর হচ্ছে।

ওপারে কারণ বা সূক্ষ্ম, এপারে কার্য বা স্থূল—মাঝে লিঙ্গস্থানীয় সূর্য। সূক্ষ্ম এপারে না আসিলে অপ্রকট। ওপার = ভিতর। এপার = বাহির।

ওপারে সাদা—তাতে লগ্নরূপে অনন্ত রঙ্গ আছে। এগুলি সাদাতে মিলাইয়া আছে। তা দেখা যায় না। তাকে প্রকট করিতে হইলে এপারের রং পরস্পর মিলাইতে হয়।

২১/১/২৬

অখণ্ড সত্ত্ব হইতে সত্ত্বাংশ বহির্গত হইয়া জড়স্তরে পতিত হয়। তাই স্থূলসৃষ্টি। অখণ্ডসত্ত্ব=স। সত্ত্বাংশ='ক'। 'ক' যখন পড়ে তখন তাহার মুখ বাহির দিকে থাকে—তাই সে আত্মবিস্মৃত হয়, ভগবদ্‌বিস্মৃত হয়—জড়ে আবদ্ধ হয়। এই যে 'স' হ'তে 'ক'-র বহিষ্কার, ইহা নিগ্রহশক্তি। যদি বহিষ্কৃত করিয়াই 'ক'-র মুখ স্বাভিমুখ করিয়া দেন, তবে বাহিরে আসিয়াও 'ক'-র লক্ষ্য 'স'-র দিকেই থাকে। ইহা জ্ঞানী বা প্রেমিকের অবস্থা। এতাদৃশ 'ক' জড়ে আসিলে, 'স'-র দিকে মুখ থাকে বলিয়া, বন্ধন হয় না। ইচ্ছামতন ফিরিতে পারে। জড়ে ফেলিবার পূর্বেই এই 'স'-র দিকে মুখ ফেরান—ইহা 'স'-র অনুগ্রহ-শক্তিসাপেক্ষ। 'স' 'ক'-র দিকে মুখ করিয়াই আছে—তবে 'ক' যতক্ষণ বহির্মুখ, ততক্ষণ তা বুঝতে পারে না। যখন 'ক' অন্তর্মুখ হবে, তখন তা বুঝতে পারবে। এই অন্তর্মুখীনতা অনুগ্রহসাপেক্ষ। প্রথমতঃ বহির্মুখ হইয়াই জীব হয়—ইহাই নিগ্রহজন্য। পরে অনুগ্রহবশতঃ অন্তর্মুখ হয়, জ্ঞান-ভক্তি পায়। 'স'-তে যে 'ক' আছে, সেখানে কোন মুখ নাই। তবে 'ক' কে বাহির করার সময় অন্তর্মুখ ভাবেও বাহির করা যায়। ইহা অনুগ্রহ-পূর্বক সৃষ্টি। এ সৃষ্টি নিগ্রহ নহে, ঠিক। বাহির করিয়া অন্তর্মুখ করা নিগ্রহপূর্বক অনুগ্রহ।

নিত্য জীবগণ সদা অন্তর্মুখ। যখন বাহির হয়, তখনও অন্তর্মুখই থাকে। লীলাশক্তিতে বাহির হয় মাত্র। লীলানিবর্তনে ফিরিয়া যায়।

চিন্ময় ধামে বহির্মুখতা থাকিতে পারে না। হইলেই জড়স্তরে পতন হয়। সেখানে সদা অন্তর্মুখতা। সেখানে ক্রমযুক্ত কাল নাই। কাজেই বাস্তবিক পক্ষে বাহির হইয়া পরে অন্তর্মুখ হওয়া সম্ভবে না। সম্ভবে জড় পর্যন্ত আসিয়া সেখানে অন্তর্মুখ করা।

২৩/১/২৬

ওপারে সরলগতি, এপারে বক্রগতি। সরলগতিতে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ। বক্রগতিতে সৃষ্টি ও সংহার। সৃষ্টি=নিগ্রহ। সংহার=অনুগ্রহ। 'স' হ'তে 'ক' যে সূর্যে পতিত হয়, ইহাই 'স'-স্থিত নিগ্রহশক্তির কার্য, তিরোধান-শক্তি। তারপরে সৃষ্টিতে পড়ে। পড়িয়াই ঘুরিতে থাকে। পরে যখন 'স'-স্থিত অনুগ্রহশক্তি ক্রিয়াশীল হয়, তখন 'ক'-র সংহার হয়, পরে 'স'-তে যাইয়া লগ্ন হয়। সরলগতি যেখানে অসীম, সেখানে সীমা স্পর্শ হয় না, 'ক' সূর্যে নামে না—সৃষ্টিচক্রে পড়ে না। সংসারে প্রবিষ্ট হয় না। সে স্থলে নিত্যচক্রের অভ্যুদয় হয়। সেখানে অনুগ্রহ-নিগ্রহ নাই। সংসারচক্র সেই নিত্যচক্রেরই

অনিত্য ও মলিন প্রতিবিম্ব মাত্র। সরলগতি সীমাতে ঠেকে বলিয়াই সংসার-চক্রের আবির্ভাব হয়।

ঊর্ধ্বরশ্মি দ্বারা সূর্য নিয়ত অমৃত পান করছেন। ঐ রশ্মি সদা ষোড়শীর সহিত সূর্যকে যুক্ত রেখেছে। উহা অখণ্ড রেখা, সরলরেখা।

অধোদিকে সূর্যের দুইটি পথ—বাম ও দক্ষিণ। এই উভয়ের আবর্তে বহুত্বের বিকাশ হচ্ছে। এই দুই পথ সমান হইয়া গেলেই সূর্যের বিকিরণ বন্ধ হয়ে যায়, সৃষ্টি বন্ধ হয়—ঊর্ধ্বরশ্মি প্রকাশিত হয়, অমৃতপানের সুযোগ হয়।

ঐ সরলরেখাতেই চন্দ্রকলা সূর্যে পতিত হয়। ঐ রেখাও যখন থাকিবে না, তখন সূর্যে জ্যোতি থাকিবে না; সূর্য নির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন।

অমৃতকলা নামিবার সময় চিৎকলা হইয়া নামে,—একপথে। পরে বহুমুখীন হইয়া সৎ-কলাতে পরিণত হয়। যাকে জড়পরমাণু বলে তাহা এই সৎকলা মাত্র।

২৪/১/২৬

মনের লয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করিলে ক্রমশঃ মনঃ লীন হইয়া যায়। কারণ, জ্ঞানসহকারে মন ও প্রাণ স্থিতিবিন্দুতে যায়। শ্বাসের অন্তে স্থিতিবিন্দু, প্রশ্বাসের অন্তেও স্থিতিবিন্দু—ঐ বিন্দুতে জ্ঞানসহ মন গেলে অসীম তাকে টানে। কিছু তাহার অংশ বাহির করিয়া লইয়া যায়। কয়েকবার এইরূপ করিলে মনের উপাদান অসীমে ছড়াইয়া যায়—ইহাই মনের লয়। আবার যখন অসীম হইতে মনের অংশ গুটাইয়া আসে, তখন মন ঘনীভূত হইয়া পৃথক্ সত্তা লাভ করে।

[১]

ব্রহ্মতেজ মূলাপ্রকৃতিতে পড়লেই বিক্ষোভ হয়। ঐ তেজকে সত্ত্বের কণাগুলি ধারণ করে ও উড়িয়া পড়ে। ইহাই মহদাদিক্রমে সৃষ্টি। ইহা আদি সৃষ্টি নহে। প্রকৃতিতে বিলীন জীবের ভোগার্থ উদ্ভব মাত্র।

এই ব্রহ্মতেজঃস্পর্শেই সুপ্ত জীব জাগিয়া উঠে।

[২]

সৃষ্টিও চিৎ-শক্তি হ'তে, সংহারও তাই। ঈক্ষণ হ'তে দুই-ই হয়। চিৎ-শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি প্রসব করেন—সৃষ্টি করেন। সত্ত্বকে—

সংস্কাররহিত সত্ত্বকে—বাহির করিয়া দেন। সংস্কার বৃত্তিরূপে ফুটিয়া উঠে। প্রথম বৃত্তি নিশ্চয়—স্থির। ক্রমে চাঞ্চল্য ও মালিন্য বিকশিত হয়।

যে পরিণাম চিৎ-শক্তি সর্জ্জন করে তাহার সীমা কাটিলেই, তাহাই সংহার করে—ফিরাইয়া আনে।

২৮/১/২৬

(১)

অজ্ঞানেতে ঘুমাইয়া আবার অজ্ঞানেই জাগে। তদ্রূপ জ্ঞানে ঘুমাইয়া আবার জ্ঞানেই জাগে। ঘুমাইবার সঙ্গে দেহস্মৃতি যায়। দেহের পরমাণুও লীন হইয়া যায়—ছড়াইয়া ব্যাপক হয়।

অজ্ঞান দ্বিবিধ—(১) প্রান্তস্থ; যেখানে ইহা ঘনীভূত, বিশুদ্ধ। লয় এখানেই হয়। (২) মধ্যস্থ; যেখানে বৃত্তি আছে। এটা ব্যবহার-ক্ষেত্র।

জ্ঞানও তদ্রূপ দুই প্রকার—'বিশুদ্ধ, ঘন' ও 'তরল'।

যাকে লোকে মৃত্যু বলে, তা এই অজ্ঞানে লয় বা ডোবা। ভেসে আবার এই অজ্ঞানেই উঠে। মৃত্যু দ্বারা অজ্ঞান-রাজ্য ভেদ হয় না।

সেই প্রকার যাকে লোকে কৈবল্য বলে তা এই জ্ঞানে লয় বা ডোবা। এখান হইতেও ভেসে আবার জ্ঞানেই উঠে। কৈবল্যদ্বারা জ্ঞানরাজ্য ভেদ করা যায় না।

অজ্ঞান ও জ্ঞানের যাহা অতীত পদ, তাহাই প্রকৃত অবস্থা। তাহাও দ্বিবিধ—একবার প্রান্তে লয়, আবার ভেসে ওঠা। ইহা ভক্তিরাজ্য। এখানে যে লয় হয়, তাহা রসে, আবার ভেসে উঠেও সেই রসরাজ্যেই থাকে। ভক্তিরাজ্যে ডুবিলেই রসলাভ। ভাসিলে ভক্তভাবে স্থিতি।

প্রথম লয় সতে, দ্বিতীয় লয় চিতে, তৃতীয় লয় আনন্দে। সঙ্কোচ-প্রসার সব রাজ্যেই আছে। সদ্‌রাজ্যে লয়ে মৃত্যু, বিক্ষেপে পুনর্জ্জন্ম। চিদ্‌রাজ্যে লয়ে কৈবল্য, বিক্ষেপে জ্ঞানী হইয়া স্থিতি। আনন্দ-রাজ্যে লয়ে রসপ্রাপ্তি, বিক্ষেপে লীলামণ্ডলে সঞ্চার।

যেখানে সঙ্কোচ-প্রসার আছে, সেখানেই দেহ আছে, শক্তির খেলা আছে। সদ্‌রাজ্যের দেহ জড়দেহ, স্থূল শরীর। লয়কালে তাহা অজ্ঞানে মিশিয়া যায়। আবার অজ্ঞান হ'তেই উহা গঠিত হইয়া উঠে। চিদ্‌রাজ্যেও দেহ আছে উহা সূক্ষ্মদেহ। লয়কালে ইহা চৈতন্যে লয় হইয়া যায়। আবার উত্থানকালে চৈতন্য হ'তেই উহা গঠিয়া উঠে। আনন্দ-রাজ্যে যে দেহ, তাহা কারণদেহ। ইহার লয় হয় আনন্দে—আবার আনন্দ হ'তেই ইহা গঠিত হয়।

সঙ্কোচ-প্রসারের মধ্যস্থলে সঙ্কোচ-প্রসার নাই—কারণ, দুই-ই সমসূত্র। সেইজন্য উহা বিচ্ছেদ অবস্থা, শিবত্ব, সাক্ষিত্ব।

জড়দেহ লইয়া যেমন চিদ্‌রাজ্যে যাওয়া যায় না, তেমনই চিদ্‌দেহ লইয়াও আনন্দধামে যাওয়া যায় না। তেমনই আনন্দদেহ লইয়াও শিবভাব লাভ হয় না।

তবে মৃত্যুকালে, কৈবল্য এবং রসপ্রাপ্তিতে শিব-সাযুজ্য হয় বটে। বস্তুতঃ জীব কখনই শিব হ'তে পারে না। কারণ, সে ত' শিবই। অতএব জীব-ভাবের দিক্ দিয়া শিবসাযুজ্য হ'তে পারে মাত্র, আবার তা হ'তে ফিরতে হবে।

ব্রহ্মত্ব লাভ করা কল্পনা মাত্র। কারণ, ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। দ্বিতীয় এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্ম হবে। অ-ব্রহ্মদৃষ্টিতে অবশ্য সঙ্কোচ-প্রসারের সীমা ছাড়াইলেই ব্রহ্মসাযুজ্য হ'ল বলা চলে। কারণ, তখন অসীমই থাকে—সীমা আপনহারা হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে আবার সীমায় আসতে হয়।

অতএব প্রকৃত পুরুষকার এই যে, যখন বাহিরে আসিতেই হবে, তখনও যেন আনন্দহারা না হই। জড়ের মুখ বাহিরের দিকে; আনন্দের মুখ ভিতর-দিকে। বহির্মুখ থাকিয়া শিবসংযোগ হ'লে আবার ব্যুত্থানকালে বহির্মুখতাই থাকিবে। এই শিবসংযোগ = মৃত্যু। ব্যুত্থান = পুনর্জন্ম। মুখহীন হইয়া শিব-সাযুজ্য হ'লে পরে উঠ্‌বার সময় তদ্‌ভাবেই উঠ্‌বে। কিন্তু অন্তর্মুখ হইয়া সাযুজ্য পেলে ব্যুত্থান হ'লেও তার অন্তর্মুখই থাকে। সুতরাং সে আনন্দের দিকে লক্ষ্য যুক্ত থাকে, আনন্দময় দেহযুক্ত, ইত্যাদি থাকে। সে আর জ্ঞানরাজ্যে নামে না। কেননা, আনন্দ-কেন্দ্র তাকে টানিয়া রাখে। বাহির হ'লেও সে আনন্দ-কেন্দ্রের রাজ্য বা আনন্দচক্র ভেদ করিয়া নামিতে পারে না। জ্ঞানে না নামলে আর অজ্ঞানের ভয় কি? জ্ঞান থাক্‌লে অজ্ঞানের শঙ্কা আছে, অজ্ঞান থাক্‌লে জ্ঞানের আশা আছে। কিন্তু উভয়ের অতীত থাক্‌লে আশাও নাই, আশঙ্কাও নাই।

অতএব জ্ঞানীরও পতনের সম্ভাবনা নষ্ট হয় না। কারণ, তাকে ঊর্ধ্বে টানিয়া রাখিবার কেহ নাই। জ্ঞানী স্বাধীন, অজ্ঞানী পরাধীন বা জড়াধীন—ভক্ত স্বাধীনও নহে, পরাধীনও নহে। যেখানে স্বাধীনতা, সেখানেই পড়িবার ভয় আছে। ভক্ত উভয়ের অতীত।

(২)

জড়দেহ মৈথুনজন্য। বিন্দুর অধোগতি হ'তে জন্মে। কাম-সম্বন্ধ হ'তে

বিন্দুর অধোগতি হয়। তাই জড়দেহ=কামদেহ। জড়দেহ স্বভাবতঃ অশুচি, মলিন। তাই ইহাতে বিকার আসে; তাই গুম্ফ-শ্মশ্রু প্রভৃতি বিকাশ পায়—এগুলি কামজন্য। এ দেহে কাল বা অগ্নির ক্রিয়া (=বিকার, পরিণাম) সদা খেলে।

যে দেহ কামসম্বন্ধ হ'তে হয় না তা বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহ। ইহা ঔপপাদিক। ইহা মৈথুনজন্য নহে। ইহা ভাবরহিত জ্যোতির্ময় দেহ। ইহাই সিদ্ধদেহ।

বিন্দুর ঊর্ধ্বসঞ্চার হ'তে যে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভাবদেহ বলে। তাতে কাম নাই, জ্ঞান বা জ্যোতিও নাই। তাহা ভাবময়, জ্যোতিহীন। ইহা অরূপ। ইহা লীলাবিগ্রহ।

প্রথম স্তর=কাম-লোক।
দ্বিতীয় স্তর=রূপলোক।
তৃতীয় স্তর=অরূপ-লোক।

কামলোকেই মৃত্যু বিরাজমান। ইহাকে উত্তীর্ণ হ'লে নিষ্কাম শুদ্ধ জ্যোতির্ময় চিদাকাশ। তাহাই রূপলোক। সেখানে সিদ্ধদেহিগণ আছেন। রূপস্তরের অবধিতে কৈবল্য বিরাজমান।

কৈবল্যের পরপারে অরূপ-ধাম। তাহার সীমা মহাসুখ বা রস-সমুদ্র। কিন্তু অরূপ ভেদ হয় না।

যাহাকে বোধি বলে, তা মধ্যম। তা সংকোচ-প্রসাররহিত। সুতরাং কামাদি তিন স্তরেই আছে, অথচ তিন হ'তে পৃথক্।

৩০/১/২৬

সাক্ষী=তুরীয়। তার সুপ্তি নাই, কাজেই জাগরণ নাই। দেবতার সুপ্তি আছে, জাগরণও আছে। দেবতা জাগিলেও সাক্ষী হয় না। সাক্ষী ভাবাতীত, দেবতা ভাবময়। বিকশিত ভাব=জাগ্রৎ দেবতা। অব্যক্ত ভাব=সুপ্ত দেবতা।

সাক্ষী সুপ্ত ও জাগ্রতে সমভাবে আছে।

তুরীয়ে যাওয়ার উপায় জাগ্রৎ হইতেই হ'তে পারে—স্বপ্ন বা সুপ্তি হ'তে নহে। তদ্রূপ পরব্রহ্ম বা সাক্ষীতে যাওয়ার উপায় দেবতা-চৈতন্য হ'তেই হ'তে পারে।

৪/২/২৬

ভোগ করা মানে সার গ্রহণ করিয়া আপন করা বা নিজের অন্তর্গত করা। ভোগ ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না। যেখানে যা কিছু আছে, সব আপন ক'রে নিতে হবে—তবে ত' বৈরাগ্য হবে। জগতের সব জিনিসেরই সার নিতে হবে।

খেলে পেট ভরে, তাই আর খেতে ইচ্ছা হয় না। না খেয়ে খাওয়ার ইচ্ছা নিবৃত্ত করা যায় না। খাওয়া মানে বস্তুর সারাংশ গ্রহণ করা। তাই ভোগ। বিশ্বকে ভোগ না ক'রলে বিশ্বকে ত্যাগ করা চলে না, বৈরাগ্য অসম্ভব। বিশ্ব = সার + অসার। ভোগ দ্বারা সার গ্রহণ হয়, অসার পড়িয়া থাকে। ত্যাগ বা বৈরাগ্যের উপদেশ তখন আবশ্যক হয় না। বিশ্বের চরম সার = অমৃত। সুতরাং ভোগ = অমৃতপান বা আনন্দের আস্বাদন। তাই ভোগ আনন্দময় কোষের ব্যাপার।

জ্ঞান যেমন সামান্য ও বিশেষ, ভোগও তেমনই সামান্য ও বিশেষ। যেমন জ্ঞেয়সামান্য আছে, আবার জ্ঞেয়বিশেষও আছে; তদ্রূপ ভোগ্যসামান্য আছে ও ভোগ্যবিশেষও আছে। খণ্ড জ্ঞেয় জানিয়া জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয় না, অখণ্ড বা সামান্যভূত জ্ঞেয়কে জানিলে তবে জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্ত হয়। কারণ, ঐ জ্ঞেয়-সামান্যে যাবতীয় জ্ঞেয়বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইচ্ছানুরূপ বিশেষজ্ঞান হয় —অথচ তাতে বন্ধন হয় না, চাঞ্চল্য থাকে না। তেমনই খণ্ড ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া ভোগের তৃপ্তি হয় না—অখণ্ড বা সামান্যভূত যে মূল ভোগ্যবস্তু আছে, তাহা ভোগ করিতে পাইলে তবে ভোগলিপ্সা দূর হয়। কারণ, জগতের যাবতীয় খণ্ডভোগ্য ঐ অখণ্ড ভোগ্যে প্রতিষ্ঠিত। তখন ইচ্ছা হ'লে বিশিষ্ট ভোগ্যও ভোগ করা যায়, অথচ বন্ধন হয় না। এই সামান্য ভোগ্য = অমৃত বা আনন্দ। বিশিষ্ট ভোগ্য = তাহারই অংশ, ছায়া, প্রতিবিম্ব, একদেশ ইত্যাদি।

৮/২/২৬

(১)

শিব = ঊর্ধ্বলিঙ্গ। তাই তিনি ঊর্ধ্বরেতা। ঊর্ধ্বরেতা হইলে বিন্দুর অধোগতি হয় না। তাই সৃষ্টি হয় না। বিন্দুর অধোগতিতে সৃষ্টি, ঊর্ধ্ব-গতিতে সংহার। অধোগতি কামজন্য, ঊর্ধ্বগতি প্রেমজন্য। স্থিতিতে কামও নাই, প্রেমও নাই। বিন্দুর অধোগতিতে যাহা দৃশ্য হয় তাহা রূপ, ইন্দ্রিয় বহির্মুখ নেত্রদ্বয়—ঊর্ধ্বগতিতে রূপ থাকে না, ইন্দ্রিয় তৃতীয় নেত্র, যাহা ঐ বিরূপের দিকে লক্ষ্যযুক্ত। তাই শিব বিরূপাক্ষ।

শক্তির সংযোগ ভিন্ন যেমন বিন্দু অধোগমন করে না, তেমনি ঊর্ধ্বগমনও করে না। শক্তি-সংযোগে বিন্দু কম্পিত হয়, হইয়া তাকে ধরিতে যায়, তার সঙ্গে এক হ'তে যায়। বিন্দু যতদিন বাহ্য পদার্থে মিশ্র থাকে, অশুদ্ধ থাকে, —ততদিন এই কম্পনানন্তর বিন্দু নামিয়া পড়ে, জীবের বা বাহিরের পরমাণু বহু পরিমাণে ঢুকিয়া তাকে নামাইয়া আনে। কিন্তু বিন্দু তখন শুদ্ধ হয়, তখন কোন নীচের বা বাহিরের জিনিসের মিশ্রণ থাকে না, তখন উহা জমাট

বাঁধিয়া যায়,—অখণ্ড হয়। ঐ স্থলে শক্তির সংযোগ হইলেই উহা কম্পিত হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে থাকে। তখন হইতেই শিবভাবের প্রারম্ভ। তখন হইতেই ঊর্ধ্বলিঙ্গত্ব, বিরূপাক্ষত্ব, ত্রিনেত্রত্ব। জমাট হইলে আর তাহা ভাঙ্গে না—অথচ গলিত হয়। ক্রমে শক্তির সমান স্বচ্ছ, ব্যাপক প্রভৃতি হইয়া যায়। কিন্তু নিজের পৃথক্ সত্তা থাকে, যদিও বিভাজ্য নহে—একময়।

বিন্দুতে প্রকৃতিসম্বন্ধ হইলেই বিন্দুতে জড়-পরমাণু ঘেরিয়া তাকে স্থূল করে ও নামাইয়া আনে। ইহার কারণ বিন্দুতে জড়-সংস্কার রহিয়াছে। এই প্রকৃতিতেও জড়াধিক্য। তাই তার সম্পর্কে বিন্দুর সুপ্ত জড়াংশ জাগে; জাগে বলিয়া বাহিরের জড়াংশ আসিয়া তাকে জড়ে বেষ্টিত করিয়া জড়ের দেশে লইয়া যায়। যদি বিন্দু সত্যই জড়-সংস্কাররহিত হয়—তবে যে কোন প্রকৃতি-সংযোগে, অর্থাৎ জড়প্রকৃতির সংযোগেও, প্রকৃতির চৈতন্যাংশই বিন্দুকে জাগায়। বিন্দু জড়াংশহীন, তাই বাহিরের জড় আসে না, ঢাকে না, নামায় না —বীর্য্যের অধোগতি হয় না; বরং ঊর্ধ্বগতি হয়। ইহাই রাসলীলা। বিন্দু-সিদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্যের পরে রাসলীলা। তবে বিন্দুকে প্রথমে জমাট করাই কঠিন। জড়প্রকৃতি দ্বারা তা হ'তে পারে না। যতদিন জমাট না হয়, ততদিন জড়-প্রকৃতি-সঙ্গ ত্যাজ্য।

কিন্তু চিৎ-শক্তি যদি বিন্দুতে সঞ্চারিত হয় তবে বিন্দুকে কম্পিত করিবে—ক্রমে জমাট করাইবে। জমাট করার কালে বিন্দুর জড়াংশ চিৎ-শক্তির ধাক্কায় বাহির হইয়া যাইবে। জমাট হ'য়ে গেলে বিন্দু ঊর্ধ্বে গতিশীল হবে।

(২)

মনে কর—একটা শব্দ শুন্‌ছ। এই শব্দ অনুধাবন কর—গভীর নিস্তব্ধ রাত্র। মন শব্দের সঙ্গে লাগাইয়া দাও। শব্দ যেমন সূক্ষ্ম হ'য়ে যাচ্ছে, মনও তেমনই ক্রমে সূক্ষ্ম হচ্ছে। মন যেন শব্দকে না ছাড়ে। খেই হারাইলে আর তাকে পাওয়া যাবে না। এইভাবে মনের সামর্থ্যমত মন তাকে অনুসরণ করবে। যে নাদের শেষ নাই, মনও তা পাবে না। তবে মন সীমাবদ্ধ, তাই সে খানিকটা গিয়ে আর এগুতে পারবে না, নিষ্ক্রিয় হবে, নিবৃত্ত হবে, আত্মহারা হবে, লীন হবে। তাহাই মনোবৃত্তিনিরোধ বা যোগ বা সমাধি। তখন চৈতন্যের প্রকাশ হবে। অবশ্য চৈতন্য স্বপ্রকাশ, মন তখনও আছে এক হিসাবে। তারপর অবশ্য মোটেই থাক্‌বে না।

যে কোন শব্দই ধর—প্রথমে তাহা একটা স্তর পর্যন্ত বৈচিত্র্যসহকারে

চলিবে—পরে অখণ্ড নাদে পরিণত হবে। সেই নাদ ততক্ষণ শ্রবণযোগ্য, যতক্ষণ মন আছে—জড়স্তরে মন আছে—সে মন যখন আর থাক্‌বে না অর্থাৎ মন যখন ঐ স্তর ভেদ করবে, তখন চৈতন্যের প্রকাশ। মনও চৈতন্যময়। ইহাই অদ্বৈতাবস্থা। তারপর চৈতন্যও নাই।

১। শ্রুতিগম্য শব্দ যা অনুসরণ করা হয়েছে=বৈখরী; ইহা আহত।

২। Follow করতে করতে যখন কর্ণের সামর্থ্য কাটাইয়া যাবে, অথচ মন আছে—তখনও সে শব্দ শোনা যাবে; তাহা=মধ্যমা, ইহা অনাহত বা ওঁকার।

৩। আর শব্দ মনঃশ্রুতিগম্যও থাক্‌বে না, তখনই অশব্দ অবস্থা; ইহা =পশ্যন্তী বা চৈতন্য। এ স্থলে মনও=চৈতন্য, শব্দও=চৈতন্য।

৪। ইহার পরে চৈতন্যও আছে বলা চলে না,—তাহা=পরা।

(৩)

বিপরীতক্রমে সৃষ্টি।

অব্যক্ত—আকাশ বা প্রকাশও নাই। স্বভাব। মূলাধার।

↓

চৈতন্য—বায়ুর গতি নাই।=আকাশ বা চৈতন্য। নাভি।

↓

নাদ—বায়ুর সরলগতি। হৃদয়ে। অনাহত নাদ—অনাদি অনন্ত।

↓

ধ্বনি—বায়ুর বক্রগতি কণ্ঠে আরম্ভ হয়। এখানে আঘাত হয়। নাদ বক্র হইয়া নানা শব্দ বা ভাষারূপে পরিণত। ইহা wave motion. সাদি, সান্ত। বাসনা হ'তে বায়ু বক্র হয়। স্থূল বায়ুই বক্র। বাসনাই স্থূলত্বের হেতু। এই স্তরেই আঘাত হয়—resistance হয়। ইহাই matter-এর স্তর। এই স্তরে দুই বিভাগ—বাহ্য ও আন্তর। মনে মনে যে শব্দ শুনি, দৃশ্য দেখি—সে সব এই স্থূল স্তরেরই অন্তর্ভাব। ইন্দ্রিয় খুলিয়া যে দেখি, বা শুনি তাহা স্থূল স্তরের বহির্ভাব। সংস্কারও স্থূল।

১। নিষ্ক্রিয় বিন্দু=আত্মা

২। সরলরেখা=বিন্দুর সরল গতি (ইহা purely rectilinear বা circular)=মনঃস্বরূপ বা শুদ্ধমনঃ

৩। বক্ররেখা=ইন্দ্রিয়

৪। (ক) সমতল (plane) 2 dimensions সংস্কারময় অন্তর্জগৎ—প্রাতিভাসিক সত্তা—স্বপ্ন।	Inner	
	বিষয়	স্থূল
(খ) ঘন (cube) 3 dimensions বহির্জগৎ—ব্যবহারিক সত্তা—জাগ্রৎ	Outer	

২৪/৯/২৬

কায়ব্যূহ কি প্রকারে হয়?

একটি ঘরে যদি চারিদিকে ছিদ্র থাকে, তা হ'লে চারিদিক্ হ'তেই আলো আসে। ফলে নিজের দেহের বহু ছায়াপাত হয়। আলোকের ধারা-সংখ্যার ভেদ অনুসারে ছায়ার ভেদ হয়। বস্তুতঃ চারিদিক্ হ'তে অসংখ্য রশ্মি আসতে পারে, ফলে অসংখ্য ছায়া হ'তে পারে। যদি এই ছায়াকে কোন উপায়ে স্থূল করা যায় তা হ'লে অসংখ্য মূর্তি হয়। আলো আসে সূর্য হ'তে—সাক্ষাৎ নহে এখানে। তদ্রূপ পরমাত্মার অনন্ত রশ্মি আছে—তাহার যতগুলি দেহে সঞ্চার করা যাবে, ততগুলি দেহ-ছায়া তৈরি হবে। পরমাত্মা জীবেরই অন্তরাত্মা। অতএব যতগুলি রশ্মি জীবকেন্দ্র হ'তে বার হবে, ততগুলি দেহ দেখা যাবে। রশ্মিগুলি প্রত্যাহরণ করলেই দেহ থাক্‌বে না।

সাকার-সিদ্ধি ভিন্ন কায়ব্যূহ হয় না। প্রত্যেকটি রশ্মি সাকার তখন হবে, যখন রশ্মিকেন্দ্র-জ্যোতিও সাকার। রশ্মি-কেন্দ্র নিরাকার হ'লে ব্যূহও নিরাকার।

২৭/১০/২৬

উপরে উঠ্‌তে হ'লে নীচের জিনিস হ'তে সার তৈয়ার—বা'র ক'রে তা সঙ্গে ক'রে আসতে হয়। মূলাধারে ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করা—এটা সার তৈয়ার ও উঠা—বরাবর চলবে—যতক্ষণ ব্রহ্মচক্রে না যাওয়া যাবে। সেখানে অসার নাই। সব সার—রস—আনন্দ। গতিও সেখানে যথার্থ সরল। অর্থাৎ চক্রাকার। Infinite-এ straight motion is circular. তাহাই মৈথুন। রাস। মাঝের গতি—সরলতার দিক্ প্রবণমাত্র।

সহস্রার গতিশীল, circular.

গতি নাই—বিন্দুমধ্যে।

১৪/১১/২৬

শুদ্ধসত্ত্বের চারিদিকে কারণার্ণব।

সত্ত্বকে শক্তিবিশেষ বিক্ষুব্ধ করে—তা হ'তে বিন্দু বাহির হইয়া কারণ-বারিতে পতিত হয়। ঐ বিন্দুস্পর্শে কারণ-বারি—জড় উপাদানপুঞ্জ—চঞ্চল হইয়া উঠে। ফলে তাহা organised হয়, দেহনির্মাণ হয়। সেই দেহে ঐ বিন্দু অনুপ্রবিষ্ট হয়।

বিন্দুর একাংশ দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নির্লিপ্ত। ইহা অন্তর্য্যামী-রূপ পরমাত্মা। অপর অংশ সত্যই অভিমানী হয়। ইহা জীবাত্মা।

ঐ যে দেহনির্মাণ হয়—ইহাই লিঙ্গ। এই লিঙ্গ চেতন। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী—ততদিন, যতদিন চিদ্‌বিন্দু উহা হইতে প্রত্যাকৃষ্ট না হয়।

এই লিঙ্গ স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে? স্থূলের ছাঁচ লইয়া অধোগতি হইলেই স্থূলাকারবিশেষ প্রাপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ বস্তু। তাই সর্ব আকার গ্রহণ করিতে পারে। সঙ্কল্প দ্বারা আকার-ভাবনাতে তদাকার হইয়া যায়। অধঃস্তরে অবতীর্ণ হইলেই তাহা স্বতঃ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল হয়। সাধারণ জীব বা লিঙ্গ অধঃস্তরে নামিয়া আপনা আপনি পঞ্চীকৃত হইতে পারে না।

স্থূল পিতামাতার সংঘর্ষকালে তৎফলে তেজের বিকাশ হয়। উহা লিঙ্গ-কোষের বিকাশ। তখন যে প্রকার ভাবনা থাকে, ঐ লিঙ্গ-কোষ তদাকার ধারণ করে। ফলে বাহির হ'তে তদাকার—তদ্‌ভাবাপন্ন লিঙ্গ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ঢুকিয়া পড়ে। তারপর অধোগতি—স্থূলতাপ্রাপ্তি।

অতএব সৃষ্টিতে কি কি পাইলাম?—

১। শুদ্ধসত্ত্ববিন্দু—চিদ্‌বীর্য।

২। লিঙ্গ (=চিদ্‌বীর্য+কারণ-বারি)।

৩। স্থূল (=লিঙ্গ+কার্য-বারি i.e. ভূতপঞ্চক)।

৪। চতুর্থ হচ্ছেন বিরাট্‌সত্ত্ব যাহা হ'তে শুদ্ধ-সত্ত্ববিন্দু ক্ষরণ হয়েছে। ইনিই ঈশ্বর। অন্তর্য্যামী রূপে ইনি সঙ্গে থাকেন। অর্থাৎ ইঁহাতে সংসার হয়। ইনি সাক্ষী।

৫। তুর্য্যাতীত—ইনি চতুর্থই—তবে—সম্বন্ধাতীত। ইনি নির্গুণ ব্রহ্ম। পরমশিব।

লয়ের সময় লিঙ্গ বাহির করিয়া নিলেই স্থূল decomposed হইয়া যায়। লিঙ্গই স্থূলকে ধরিয়া রাখে, চালায়। Decomposed হইয়া পঞ্চভূত আলাদা আলাদা হইয়া যায়। সমষ্টিটা ভাঙ্গে মাত্র। তন্মাত্রা হয় না।

লিঙ্গ তখন থাকে। লিঙ্গ হ'তে সত্ত্ববিন্দু টানিয়া নিলে লিঙ্গও ভাঙ্গিয়া যায়। এইবার সব আলাদা আলাদা হইয়া যায়।

ইহার পর সব ভিতরের ব্যাপার। তখন সত্ত্ববিন্দু বিরাট্‌সত্ত্বে যুক্ত।

যতদিন লিঙ্গ থাকে, ততদিন স্থূলের সমষ্টি না থাকিলেও তন্মাত্রায় স্থূলাভাস থাকে। লিঙ্গে স্থূলের দাগ থাকে। শুদ্ধ লিঙ্গ থাকিতে পারে না।

মৃত্যুর পর পরমাণু ছড়াইয়া যায়।

লিঙ্গভঙ্গের পরে তন্মাত্রাদি ছড়াইয়া যায়। তিন গুণের সাম্য হয়। সত্ত্ব-বিন্দু লিঙ্গ হ'তে বাহির হইয়া গেলে গুণসাম্যের কোন বাধা থাকে না।

১৫/১১/২৬

সূক্ষ্ম না হ'লে ব্যাপক হ'তে পারে না। অথচ সূক্ষ্মই অণু। সবচেয়ে অণু যে, সে-ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক।

বিন্দু ঘনীভূত অবস্থায় আছে। ইহাই স্থূল। ইহা যতই সূক্ষ্ম হয়, ততই ইহার বিকিরণ হয়। রশ্মি ছড়াইয়া যায়। যাহা ছড়ায়, তাহা বিন্দুকে ঢাকিয়া স্তরবিন্যস্তভাবে ছিল। এইপ্রকারে সকল স্তরই ছড়ায়। সেই অনুপাতে বিন্দু ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হ'তে থাকে। চরমে সূক্ষ্মতার চরমাবস্থায় ব্যাপ্তি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাহাই যোগ।

১৬/১১/২৬

"ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"। একদিকে বিষয় বা ভূত। মাঝে মন। মন হইতে যখন বিষয় কাটিয়া যায়, আলম্বন থাকে আত্মা।

২০/১১/২৬

(১)

বিভূতি=ছটা। জগৎটাই তাঁর বিভূতি। ক্রিয়া করিতে করিতে তাঁর কত বিভূতি দেখা যায়। তাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি আসে না। ক্ষুধা মেটে না। ইন্দ্রজাল হ'তে অভাব-নিবৃত্তি হয় না। আসল বস্তু চাই। ছায়াতে কি হবে?

বস্তুই উপাদান, বর্ণস্বরূপ, মাতৃকারূপ। আমরা যা সচরাচর দেখি, তা শুধু তার বহিঃ-ছটা মাত্র।

(২)

যেখানে শব্দ, সেখানেই আকাশ। স্থূল শব্দ এখানে নিরন্তর হচ্ছে। এটা স্থূলাকাশ। ইহার ভিতরে সূক্ষ্ম আকাশ। সেখানে অনাহত শব্দ হচ্ছে। তাহা অন্তরাকাশ।

স্থূলাকাশে যে শব্দ হয়, তাহা আঘাতজন্য—তাহা অনিত্য, তাহা বহু বিচিত্র। অনাহত শব্দ, নিত্য, একরস।

৫

অন্তরাকাশে লক্ষ্য না থাকিলেই শব্দ কাটিয়া গেল। অন্তরাকাশই চিদাকাশ। তাহার অবশ্য স্তর আছে। স্তরসন্নিবেশ অবশ্য স্থূলাংশের সম্বন্ধবশতঃ।

জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থাত্রয় স্থূলের ব্যাপার। অন্তরে তুরীয়।

অন্তরে লক্ষ্য না থাকিলে তুর্য্যাতীত।

অনাহত শব্দে লক্ষ্য না থাকা মানে মন স্থির হইয়া যাওয়া। অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যতক্ষণ মন ক্রিয়া করে,—ততক্ষণ শব্দ, ততক্ষণ বিশ্বরূপ প্রকাশ। মন নিষ্ক্রিয় হইলে শুদ্ধ চৈতন্যই বা আত্মাই থাকে। তখন অশব্দাবস্থা। মন কাজ করিলে শব্দময় অবস্থা বা শক্তির স্ফুরণাবস্থা।

প্রত্যাহারের পরেই অন্তরঙ্গ যোগ। সেটা অন্তরাকাশে প্রবেশান্তর। ধারণাদি অঙ্গ বস্তুতঃ অনাহত শব্দের ক্রমশঃ অশ্রুততা হওয়া—অর্থাৎ মনের ক্রমিক নিষ্ক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তা সিদ্ধি = সমাধি।

বাহ্য জগতে মন নিষ্ক্রিয় হয় না। কারণ, স্থূল = বাসনাময়। ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া থাকিবেই। ইন্দ্রিয় = মনের বাহ্যবৃত্তি। বাহ্যবৃত্তির কারণ মনের স্থূলতা, অর্থাৎ সংস্কারযুক্ততা। ততক্ষণ ইড়া-পিঙ্গলার ব্যাপার।

সুষুম্নায় প্রবেশ করিলে মন সূক্ষ্ম হয়, সংস্কার কাটিতে থাকে। চরমে প্রত্যাহার হয়। বাহ্য সম্বন্ধ থাকে না।

অনাহত নাদ প্রকাশ হইলেই বুঝিতে হইবে—মন বা প্রাণ সুষুম্নায় কাজ করছে—কিঞ্চিৎ। কিছু কিছু সংস্কার কাটছে।

১২/৪/২৭

একটি বস্তু আছে—"ক"। আমি যখন এটিকে দেখি—তখন এর সত্তা আমার কাছে প্রকাশমান। তদ্রূপ অন্যান্য লোকে যখন একে দেখে তখন এর সত্তা তাদের কাছে প্রকাশমান। এই যে সত্তা, যাহা সমভাবে স্ব-রূপে প্রকাশমান থাকিয়াও ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্নভাবে প্রকাশমান হয়—তাহা চিন্ময়ী। ভিন্নভাবে যে প্রকাশ তাহা প্রাতিভাসিক। স্ব-রূপে যে প্রকাশ তাহা পারমার্থিক। উভয়ই অব্যবহার্য্য। উভয়ত্রই ক্রিয়ানুপ্রবেশ নাই।

ক্রিয়া-সামর্থ্য শুধু স্থূলে আছে। স্থূলই ব্যবহার্য্য।

স্থূল বা ব্যবহার্য্য = ইন্দ্রিয়গোচর।

সূক্ষ্ম বা প্রাতিভাসিক = (ক) মনোগোচর। ইহা মিথ্যা। (খ) বুদ্ধিগোচর। ইহা সত্য।

স্বরূপভূত = স্বপ্রকাশ।

যতক্ষণ মনের ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আছে, ততক্ষণ দৃশ্যের রূপ ঠিক ঠিক

জানা যায় না। ইন্দ্রিয় হ'তে বিবৃত হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় কল্পনা করিতে পারে না বলিয়া সেখানে আরোপ হয় না। আরোপ হয় মনের ক্ষেত্রে। কারণ অবশ্য বাসনা ও পূর্বসংস্কার। মন স্থির হ'লে যে দৃশ্য ফোটে তাহা বুদ্ধি-গ্রাহ্য ও যথার্থ। দৃশ্যের ইহাই চরমরূপ—ইহাও জড়। ইহা মায়িক। তবে সত্য। কিন্তু দ্রষ্টা হইতে পৃথক্।

বুদ্ধি কখনও নিত্য হ'তে পারে না তাই এ দৃশ্য অর্থাৎ বিশ্ব অনিত্য। বুদ্ধি ও বিশ্ব co-extensive। কেহ কেহ মনে করেন ইহাই বিশ্বরূপ।

বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে দৃশ্য অব্যক্ত হইয়া যায়—তখন পুরুষের কৈবল্য হয়। পুরুষ অব্যক্ত দৃশ্য বা মূলা প্রকৃতিকে দর্শন করেন; অবশ্য উদাসীনভাবে।

কিন্তু এই দর্শনেরও মূলে মহামায়ার যোগ আছে। যদিও দ্বৈত হিসাবে ইহা চরম বিশুদ্ধজ্ঞান।

মহামায়ার কৃপা হ'লে এই অব্যক্ত দৃশ্য বা প্রকৃতিকে আত্মরূপে দর্শন হয়। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—সবই চৈতন্য। একরস। ইহাই অদ্বৈতে বা ব্রহ্মে প্রবেশ।

(২)

আত্মরূপে যে দর্শন তাহা দেশকালের উপরে। এমন কি, বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃশ্যও খণ্ড দেশ-কালের উপরে। কারণ, সেখানে অতীত ও অনাগত বর্তমান; বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট।

মনের সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ড দেশ ও কালের আবির্ভাব। মনোদৃশ্য সূক্ষ্ম হইলেও দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তাই তাহাতে ভ্রমের ও সংশয়ের স্থান আছে। ইন্দ্রিয়দৃশ্যও তদ্রূপ। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ=মনোদর্শন ও ইন্দ্রিয়-দর্শন মাত্র।

সুষুপ্তিতে মনের ক্রিয়া না থাকিলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে প্রবেশ হয় না। বুদ্ধি-ক্ষেত্রে যাইতে পারিলে সুষুপ্তি কাটিয়া যায়—তখন হইতে ধ্যানের আরম্ভ হয়। সমাধি পর্যন্ত বুদ্ধির ক্ষেত্রস্থ। বুদ্ধির বাহিরে অজ্ঞান খেলা করে—ইহা রজোরূপী। ইহাই মনের উৎপাদক ও চাঞ্চল্যকারক। বুদ্ধির উপরেই সত্ত্বরূপী অজ্ঞান আছে—যাহাতে ব্যক্ত-দৃশ্য দেখায়, যাহাতে অব্যক্ত প্রকৃতিকে ব্যক্ত-দৃশ্যরূপে বাহির করে বা দেখায়। বুদ্ধি তাহা দেখে। মনের বাহিরে আর একটি অজ্ঞান আছে—তাহা তমোরূপী। ইহার প্রভাবে মন ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। ওদিকে সূক্ষ্ম-দৃশ্য স্থূল হয়।

সত্ত্বরূপী অজ্ঞানকে কাটাইতে পারিলে অব্যক্ত দর্শন হয়। ইহা বুদ্ধির

বৃত্তি নহে। অব্যক্ত প্রকৃতির দর্শন=গুণত্রয় দর্শন। ইহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা হয়। শুদ্ধ সত্ত্বের উপরে যে অজ্ঞান বা আবরণ আছে, সেটা কাটিলে শুদ্ধসত্ত্ব নিজেই দৃশ্য হয়। সেটা চৈতন্যের আপন আলোকে হয়। সেই আলোকের উপসংহারের সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধসত্ত্বও অস্তমিত হইয়া যায়। থাকে শুধু চৈতন্য। সে-ই দ্রষ্টা, সে-ই দৃশ্য। সেটা স্বপ্রকাশ। চৈতন্যালোকের প্রসারণ বা উপসংহার হয় স্বাতন্ত্র্যবশতঃ। ইহা স্বাধীনতা।

২৩/৬/২৭

আগুনে কাগজ ধরিলে পোড়ে। আগুন পোড়ায়, তাই পোড়ে। দাহকার্যে আগুনের কর্তৃত্ব আছে। অতএব ইহাও বস্তুতঃ স্বাভাবিক কার্য নহে। দাহ আগুনের **স্বভাব**—একথা লৌকিক মাত্র। এই কার্যের মূলেও ইচ্ছা আছে। তাই ইচ্ছা দ্বারা ইহা নিয়মিত হইতে পারে; স্তম্ভিত হইতে পারে।

জগতের সব কার্যেরই মূল ইচ্ছা।

ইচ্ছা আর স্বভাবে ভেদ কি? ইচ্ছার পূর্ণতাই স্বভাব বা আনন্দ। পূর্ণ ইচ্ছা=স্বভাব। স্বভাবের বিকার নাই—পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা পূর্ণ ইচ্ছা তাই নির্বিকার। আধারভেদে সেই ইচ্ছা নানাপ্রকারে অপূর্ণ হয়, সীমবদ্ধ হয়, বিকৃত হয়।

আমরা সাধারণতঃ য়াকে ইচ্ছা বলি,—তার উদয় ও অস্ত আছে, তাহা জন্য ও বিকৃত। পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য প্রকাশমান, নির্বিকার; তাহাই স্বভাব। তাহা পূর্ণ বলিয়া কেহ তাকে ইচ্ছা বলেন না। তাহাই আনন্দ। কিন্তু তাহা সদা একরস বলিয়া তাকে পূর্ণতা বা স্বভাব বলাই ভাল। আধার-সম্বন্ধে তাহাই সীমাবদ্ধ হয়। তখন তাহা হয় ইচ্ছা—পূর্ণের স্পর্শে হয় আনন্দ। স্বভাব বা পূর্ণ নিরাধার। ইচ্ছা বা আনন্দ শব্দ লৌকিক অর্থে প্রয়োগ করতে হ'লেই বিষয়-সম্বন্ধ চাই—আধার-সম্বন্ধ চাই। বিন্দুই মূল আধার। তাহাকে গ্রহণ করিলেই ইচ্ছার স্ফুরণ হয়, আনন্দের বিকাশ হয়। তাহাই সৃষ্টির উন্মেষ। বিন্দুকে ত্যাগ করিলেই পূর্ণতা—বিশুদ্ধ স্বভাব। তাহা নিত্যানন্দ, পারমৈশ্বর্য্য—তাহার বিকাশ ও লয় নাই।

১/৭/২৭

কাম তৃষ্ণাবিশেষ। ইহার নিবৃত্তি হইলে কাম্যবিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। আবার কাম হয়—আবার বৈরাগ্য হয়। কাম যদি একেবারে চাপা পড়ে বা ধ্বংস হয়, তবে স্থায়ী বৈরাগ্য হইতে পারে।

বস্তুতঃ ইহা পথ নহে। কাম—রাগ বা ভালবাসা নহে। কাম অশুদ্ধ

বলিয়াই তাহার নিবৃত্তি হয়। পরে কাম থাকে না—তাই বৈরাগ্য। প্রথমে কাম-কালে যাহা ভাল লাগে, পরে বৈরাগ্যকালে তাহাই মন্দ লাগে। সুতরাং এ ভাল লাগার মূল্য নাই—ভরসাও নাই। ভালবাসা বিশুদ্ধ। তাহার নিবৃত্তি নাই। তাই তাতে তৃপ্তি নাই—ফলে, বৈরাগ্যও নাই। রাগমার্গে বৈরাগ্য অনাবশ্যক।

রাগমার্গে ভাল লাগা ক্রমশঃ বাড়ে বই কমে না। কাম অপূর্ণ, তাই তার তৃপ্তি বা অবসান আছে। প্রেম পূর্ণ, তাহার সমাপ্তি নাই।

কাম ও প্রেম একই জিনিস। অশুদ্ধ আর শুদ্ধ। কামকে বিনাশ করিলে জগতের শোভা আর দেখা যাবে না। তাকে শুদ্ধ করিয়া রাগে পরিণত কর—দেখিবে তাহা তোমার চিরসাথী; ফলে, সর্বত্র আনন্দ—চিরবর্ধমান আনন্দ।

২০/৮/২৭

দুইটি বিন্দু—দুইটি শক্তি, যখন বহির্মুখ হয়, তখন জগৎ দর্শন হয়, জগতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু দুইটি মিলিত না হ'লে তা হয় না।

৩/৯/২৭

আলোর source আছে, তা হ'তে বিকিরণ হয়। আঁধারেরও source আছে। আলোর মূল source বা জ্যোতীরাশি, যাহা দ্যুলোকের nucleus. আঁধারের মূল source পৃথিবী ও পার্থিব বস্তু—বিশেষতঃ পৃথিবীর কেন্দ্র।

এই দ্যুলোক ও ভূলোক— Heaven ও Earth—সত্ত্ব ও তমঃ। বিকিরণ = রজঃ। বাহিরে যে আলো দেখি তাহা আলো-কণ তমঃকণ মিশ্র, তমঃকণ আলোক-কণ মিশ্র। এই কণগুলিই রজঃ। ইহা মিশ্র।

সত্ত্বকণ যদি সত্ত্ববিন্দুতে এসে লীন হয়, তমঃ-কণ যদি তমোবিন্দুতে এসে লীন হয়,—রজঃ আর থাকে না। সেটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। অতএব রজঃ = সত্ত্ব ও তমঃ বিন্দুনিষ্ঠ শক্তি। সত্ত্ব ও তমঃ সর্বতোভাবে পৃথক্ হইলে মধ্যস্থল ফাঁক হয়। অবশ্য তখন উভয়ই অব্যক্ত বলিয়া "মধ্য" কথা আর বলা চলে না। তাহা চৈতন্য, পুরুষ।

১৬/৭/২৮

মন ইন্দ্রিয়পথে বাহিরে ছড়াইয়া যায়। কিন্তু মনকে সংযত করিয়া আনা যায়। তখন ইন্দ্রিয়ের কাজ হয় না—বিষয়-জ্ঞান থাকে না। সংকল্প থাকিলে শুধু সংকল্পিত বিষয়ই জাগিতে থাকে। এইভাবে ইষ্ট-বস্তু দর্শন করা একাগ্র মনের পক্ষে সম্ভবপর। একটা বিরাট্ চৈতন্যের মধ্যে জগৎ ভাসছে। সেই

বোধে প্রয়োজনমত ইষ্টবস্তুও ভাসছে। তাহাই যেন ইষ্টাকার ধারণ করে। বস্তুতঃ ঠিক ঠিক বস্তুরই দর্শন হয়। মনঃ স্থির হইলে প্রাণও স্থির হয় বটে —কিন্তু সেটা যথাস্থানে হয় না। সেইজন্য ইষ্টবস্তু বা স্থান যথাযথ দর্শন হইলেও সেখানে যাওয়া বা সেখানে আবির্ভূত হওয়া যায় না। তন্ময়তা—ধ্যান-ভংগ হইলেই যে সেই। খালি মন দেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না। সে দেখিতে পারে বটে—স্বস্থান হইতে সব। প্রাণ কর্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা ছড়াইয়া যাইতেছে। তাহারও সংযমের প্রণালী আছে। তাহাই প্রাণায়াম। তাতে সিদ্ধ হ'লে কুণ্ডলিনী জাগে—নাভিচক্র ফোটে—শক্তি উদ্দীপিত হয়। ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়। তখন প্রাণশক্তি যথাস্থানে যাইয়া স্থির হয়। তখন ইষ্টবস্তুর স্থানে মন যাইতে পারে। কারণ, এ মন শুদ্ধ মন নহে, প্রাণযুক্ত মন।

ইহার পরেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়।

২৬/৭/২৮

[বদরীনাথ শাস্ত্রীকে বুঝাবার সময় প্রত্যক্ষ হ'ল।]

প্রথম অব্যক্ত—সাম্য—পরমপদ

১। বিন্দু

বিশুদ্ধ বায়ু= সরল। ২। নাদ—সাদা আলোক। ব্যাপক। ওঁকার। স্বরহীন।

মলিন বায়ু= বক্র। ৩। মাতৃকা বা বর্ণ। রংগ

৪। বীজ। এখান হ'তে স্থূল সৃষ্টি। কারণ। এই বীজ-ত্যাগ শুদ্ধ সংকল্প হইতে হয়।

দ্বিতীয় প্রকৃতি—ক্ষেত্র—গর্ভকোষ

তৃতীয় কার্য—সন্তান ভূমিষ্ঠ—লিংগ—কার্যবিন্দু—মন। এই বিন্দু-ত্যাগ মলিন সংকল্পে বা কামে হয়। ক্ষেত্র পঞ্চভূতময়।

চতুর্থ ফল—স্থূলদেহ।

বীজকে মাতৃকা, মাতৃকাকে নাদ, নাদকে বিন্দু করতে হয়। বিন্দু অব্যক্ত হয়—ব্যক্ত হয় স্বভাবে। সাধনার চরম বিন্দুস্থিতি। মাতৃকা পঞ্চাশৎ—কারণ, ৪৯ বিকৃত বায়ু, ১ প্রকৃতি বায়ু। বায়ু এক হ'লেও সপ্ত রশ্মিভেদে সপ্ত-বর্ণ—কাজেই ৭ বায়ু। সপ্তীকরণে ৪৯। মূলসহ ৫০। এই ৫০ মাতৃকা বা বর্ণমালাই 'অ—ক্ষ'মালা। ইহাই ষট্‌চক্রের তেজোরাশি।

বীজকে মাতৃকায় পরিণত করতে হয়। যাবতীয় বীজ ঐ ৫০ মাতৃকাতে

বিলীন হইয়া যায়। ৫০ মাতৃকা এক মাতৃকায় দাঁড়ায়। সেই মাতৃকা মূলরূপা —ত্রিবর্ণাত্মিকা। এক একটি বর্ণ এক একটি রশ্মি বা রেখা। সুতরাং ইহা রেখাত্রয়ময়ী। অর্থাৎ ত্রিকোণাকার। অর্ধমাত্রা নাদবিন্দু-পথ লইয়া। ইহাই সার্ধবলয়াকারা কুণ্ডলিনী। একই সরলরেখা বাঁকিয়া ত্রিভঙ্গ—তিন কোণা—হইয়াছে। আবার ব্রহ্মতেজের প্রভাবে তাহা সরল হইয়া যায়। তখন আর মাতৃকা থাকে না। মাতৃকা হইতেই বন্ধন—আবরণ। কারণ তিনরেখা হইয়া আবরণ হয়। রেখা সরল হ'লে রং সাদা হয়—স্বরাদিহীন অনাহত নাদ ফোটে। ইহা বিশুদ্ধ বায়ুভূমিতে। তখন ব্রহ্মনাড়ী উন্মুক্ত। ইহাই নাদের স্তর। সর্ব-ব্যাপক নাদই তখন আছে—মাতৃকা আর নাই, বর্ণ নাই। এই অবস্থায় সরলরেখা ঊর্ধ্ব বা অন্তঃ আকর্ষণ। মাতৃকা হইতে মাধ্যাকর্ষণ বা বাহ্যাকর্ষণ আরম্ভ। নাদ উপসংহৃত হইলেই বিন্দু বা চৈতন্য। নাদও চৈতন্য বটে—তবে শক্তিরূপ। বিন্দু শিবরূপ। অথবা নাদ ব্যাপক-শক্তি, বিন্দু ঐ শক্তিধারার ঘনীভূত অবস্থা—উহাও শক্তি বটে। ইহা অব্যক্ত হ'লেই শিবপদ।

বিন্দু হ'তে সৃষ্টি হয়—বিন্দুতেই লয় হয়। যখন মাতৃকা বা বর্ণ কয়েকটি মিলিত হয়, তখনই বীজ উৎপন্ন হয়, যাহা ক্ষেত্রে পড়িলেই সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। অনন্ত বীজ এইপ্রকারেই বর্ণ-সংঘাতে জন্মিয়াছে। কিন্তু যাবতীয় বর্ণ সমভাবে মিলিলে সাদা হইয়া যায়—তখন কোন বর্ণ থাকে না। যে তেজঃ ফোটে তাহাতে দাহিকা-শক্তি থাকে—তাহা মনকে দগ্ধ করে, গতিকে সরল করে, তখন মাতৃকা বা বর্ণ থাকে না। তাহা 'অগ্নি' নামে খ্যাত। এই অগ্নিই পাবক। ইহা সব ভস্ম করিয়া ফেলে। এ অগ্নিও বস্তুতঃ সূর্যমণ্ডল—প্রতিবিম্বভূত। ইহা জাগিলে বিন্দুর টান অনুভবে আসে। এই তেজে উঠাইয়া নেয়। কিন্তু মাতৃকার কয়েকটি যদি মিলে, তবে বীজ হয়। তাতে অগ্নি জাগে না, তাহা সংহারসূচক নহে। তাতে বিন্দু হ'তে অমৃতে এসে পড়ে। তাই বীজ শক্তি। আদৌ সৃষ্টি, পরে অনুপ্রবেশ। বিন্দুনাদক্রমে। চন্দ্রবিন্দু হ'তেই সৃষ্টি হয়। কয়েকটি মাতৃকা মিলিত হইলেই বীজ হয়—তাহার সহিত বিন্দুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এ অবস্থায় অধ-আকর্ষণ থাকে। বিন্দুর ধারা তাই নেমে এসে বীজে পড়ে। এটি ক্রিয়া। ইড়া-পিঙ্গলা খেলে। বৃষ্টি যে হয়, মেঘ—মেহন—যে বর্ষণ করে, বর্ষ্ম বা বপুঃ তৈয়ার করে—এই পথে। বিন্দুপাতই সৃষ্টির মূল। ইড়াদি পথে এটা এসে পড়ে—নামে।

Focuss ক'রে অগ্নিও হয়—যা সংহারক। আবার বীজও হয় (চন্দ্র-কলাত্মক)—যাহা সৃষ্টির মূল। সব বর্ণ সংহত না করলে অগ্নি হয় না। সব মাতৃকার সমষ্টি এক হ'লে সাদা হয়—ঊর্ধ্বাকর্ষণ তখন স্বতঃই ফোটে।

কতিপয় মাতৃকার সংঘাতে জগতের যাবতীয় পদার্থের বীজ হয়—যাতে কোন না কোন বর্ণের প্রাধান্য থাকে। অধ-আকর্ষণ থাকে।

২৫/৫/৩০

স্থূলাবরণ মুক্ত হ'লে একটি আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সব জীবকে সেখানে নক্ষত্রের মতন দেখায়—যার যেমন বিকাশ। বিকাশ কম হ'লে দেখা যায় না।

সে আবরণ ভেদ করলে কারণ দেখা যায়। সূক্ষ্মে যেখানে বিকাশ দেখাচ্ছে না, কারণে সেখানে খুব বিকাশ হ'তে পারে।

১৬/৬/৩১

সকল দেহের বোধ স্পর্শাশ্রয়ে এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত কর। কোন কিছু স্পর্শ ক'রো না। শুধু ভূমিস্পর্শ রহিল। সেই স্পর্শকে বোধ দ্বারা সজীব কর। সেখানেই আমিত্ব এসে জমবে।

পরে সেটা আল্‌গা হ'য়ে যাবে। তখন আকাশস্থিতি—শূন্যে স্থিতি। সেটা স্থূল হ'তে লিঙ্গের বিবিক্ততা।

আল্‌গা হওয়ার উপায় কি? স্পর্শ তক আমিত্ব ঘনীভূত হ'য়ে দেহের স্থানবিশেষে নিবদ্ধ। সেটা একাগ্রভাব। সেখানে এলেই একটা ব্যাপক ও বিরাট্ সত্তা বোধে ভাসতে থাকে। সেটাকে ধরলেই স্পর্শ ছেড়ে যায়। কিছু না ধরে স্পর্শ ছাড়া যায় না।

ব্যাপক সত্তাকে ধরা যখন আয়ত্ত হয়, তখন ওকে ধরিয়া যা ইচ্ছা করা যায় ও স্থূল ছাড়িবামাত্রই তাই প্রতিভাত হয়। বিরাট্ সত্তাসাগরে লিঙ্গ ভাসতে থাকে, আমিত্ব মাত্র লিঙ্গ থাকে। যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই দর্শন হয়। এ দর্শন দৃশ্য সাথে আংশিক একাত্মতা। অথচ দ্রষ্টা পৃথক্ থাকে। দৃশ্যদর্শন যুগপৎ হয় না।

লিঙ্গও রঞ্জিত হয়। তার পেছনে যেতে পারলে সাদা আলো পাওয়া যায়। সে স্থির আলোকে লিঙ্গের ক্রমিক রঞ্জন দেখা যায়। লিঙ্গের বাহিরে গেলেই কারণে অহম্ভাব থাকে। যুগপৎ দর্শন হয়—পূর্ণ বা আংশিক। ঈশ্বরকারণ বা জীবকারণ। ইহা অভেদ-দর্শন।

২৪/১০/৩১

কার্যবিন্দু=অণু। কার্য যাহা, বিন্দু তাহার অণু। এই অণুর ক্রম-বিকাশই কার্য। ইহার পুষ্টিই তাহার জীবন। পূর্ণকল অগ্নি এই অণুতে

বর্তমান। ইহা প্রবুদ্ধ—যতক্ষণ ইহার অভিভব না হয় ততক্ষণ সৃষ্টি বিকাশ হ'তে পারে না। ইহার অভিভাবক সোম। সোমকে জাগাতে হয়। জাগলেই সে স্বভাবতঃ বাহিরের দিকে ধাবিত হয়। ফলে সোমকলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণু পুষ্ট হ'তে থাকে। সোমের পূর্ণতা হ'লেই জীবন সমাপ্ত হয়।

৫/১/৩২

শুদ্ধসত্ত্ব—খণ্ড—প্রতি জীবের সঙ্গেই আছে। চোখ বুঁজিলে যে অন্ধকার দেখা যায়, উহা শুদ্ধ-সত্ত্বের উপরকার আবরণমাত্র। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবরণে তারতম্য ঘটে। নানা রং দেখা যায়। উহা বস্তুতঃ মূলাধার বা back-ground. যখন ভিতরের অন্ধকার দূর হয়, তখন উহা একখানা দর্পণের ন্যায় প্রকাশিত হয়। উহাতে সর্বকাল, সর্বদেশ প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। তবে ইচ্ছা হওয়া চাই।

ঐ দর্পণখানা একটি আকাশের মতন। উহাই দহরাকাশ। চোখ খোলা থাকিলেও উহা ও উহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তদ্বৎ কান খোলা থাকিলেও উহার শব্দ শোনা যায়। উহার ক্ষোভ হ'তেই রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি ফোটে। উহা শব্দাদির প্রকৃতি।

বাহিরে যা কিছু দেখ্‌ছি, বা শুন্‌ছি ইত্যাদি ইহা মলিনসত্ত্বের উপর। বহিরাকাশে। বাহ্যজগতের ভিতরে ভিতরে অন্তর্জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

শুদ্ধসত্ত্বই বিন্দু। বিক্ষেপ কাটিয়া একাগ্রতা হইলে, পরে প্রজ্ঞা পাইলে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিন্দুর ক্ষোভ হ'তেই নাদ বা বেদের আবির্ভাব। সমগ্র অন্তর্দৃশ্য বেদেরই রূপ। একের মধ্যেই সব দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিন্দু স্থির না করিলে ঐ দর্পণ প্রকাশিত হয় না। বেদ বা নাদ বা জ্ঞান ঐ দর্পণের স্বাভাবিক স্ফুরণ। উহাকে আশ্রয় করিয়া তবে চৈতন্যে যাওয়া যায়।

৫/১/৩২

কলার সমষ্টিতে বিন্দু। নাদের ঘনীভূত ভাবই বিন্দু। যখন কলা ছড়ান, তখন নাদও ছড়ান। গুটাইলেই বিন্দু। এই বিন্দুর মধ্যটি শূন্য—সেখানে নিষ্কল দেখা যায়।

শূন্য মানে ঐ কলা নাই—তাই নিষ্কল। তবে সূক্ষ্মতার কলা আছে—তাহা তখন জানা যায় না। শূন্য ভেদ হইলেই ঐ সূক্ষ্ম কলাময় জগতে প্রবেশ হয়। সেখানেও কলাসমষ্টি হ'য়ে বিন্দু পাওয়া যায়। সেখানকার শূন্য = মহাশূন্য। সেখান হ'তে নিষ্কল দেখা যায়। পূর্ববৎ।

ইহার পরের যে শূন্য তাহা অতিশূন্য—সেখানে স্থিতি পাইলে যথার্থ নিষ্কল হওয়া যায়।

বিন্দু হইতে কণাসকল বাহির হইতেছে।—

A হইতে B বাহির হয়—সরলরেখায়। B হইতে b^1, b^2 ইত্যাদি বাহির হইয়া Aকে ঘিরিয়া ফেলে। ঘেরা শেষ হইলেই B হইতে C বাহির হয়—সেখান হইতে c^1, c^2, c^3 প্রভৃতি বাহির হইয়া প্রথম চক্রকে বেষ্টন করে। এই-প্রকার শেষ পর্যন্ত।

সুতরাং A হইতে B-র দিকে রেখাপাত করিলেই স্তরে স্তরে চক্ররেখাগুলি আপনিই হইয়া যায়। E-তে শেষ।

আবার E হইতে A-তে আসার সময় সব চক্র গুটাইয়া যায়।

১৩/১/৩২

(১)

সমগ্র জগৎটি বায়ুর মধ্যে ভাস্ছে—সব দৃশ্যই তাতে ভাস্ছে। ব্যবধান, গুরুত্ব, ভিন্নতা প্রভৃতি সবই ইহারই ফল।

যখন আকাশ দর্শন হবে, তখন দেখা যাবে সমগ্র জগৎ—বাহ্য জগৎ—আকাশে ভাস্ছে। ঠিক যেন দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব। বায়ুতে দেখিলে আড়াল থাকে—আকাশে দেখিলে আড়াল বা আবরণ থাকে না। বায়ুতে দেখা মানেই ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা। বায়ু সরাইয়া বা নিষ্কম্প করিয়া আকাশে দেখিলে একস্থ সমগ্র বিশ্বই দর্শন হয়। ইহাই বিশ্বরূপ-দর্শন। এই সময়ে ইন্দ্রিয় থাকে না —অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়—তা দ্বারা দেখা যায়। জগৎ সবই দেখা যায়—ঠিক যেন প্রতিবিম্বের ন্যায়। প্রতিবিম্ব যেমন ঠিক বিম্বের ন্যায়, অথচ গুরুত্বাদি, ব্যবধানাদি-বর্জিত,—ইহাও সেইপ্রকার। তখন বুঝা যায় জগৎটা আকাশেরই বিবর্ত—আকাশ হইতেই উঠে, আকাশেই থাকে, আবার আকাশেই মিলাইয়া যায়। এই আকাশই মূলভূত।

এই দর্শন দুইপ্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কাম দর্শনে আকাশে সমগ্র জগৎটাই দেখা যায়। আকাশের সঙ্গে অভিন্নভাবে। আকাশ এক ও অবিভক্ত, জগৎও এক ও অবিভক্তই দেখা যায়,—ঠিক যেন আকাশই। বিভক্তভাবে দেখিলে সমগ্রদর্শন হয় না। সুতরাং সমগ্র জগৎ দেখা মানে বিশুদ্ধ আকাশ দেখা বা একখানা নির্মল আয়না দেখা। ইহাই জগতের প্রকৃতি-দর্শন।

কোন বিশিষ্ট জিনিস দেখিতে হইলে কামনা বা ইচ্ছা চাই। উহা সকাম দর্শন। ঐ আকাশ কাম-প্রভাবে ইষ্টপদার্থরূপে বিকার বা বিবর্ত প্রসব করে।

আকাশ দর্শন করিয়া—আকাশ হইয়া—যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই অবির্ভূত হয়। ইষ্ট-বস্তুর আবির্ভাব বা উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি—একই কথা।

এইরূপ আরও একটি আকাশ আছে—তাহাকে 'চিত্ত' বলে। উহাও এক-জাতীয় দর্পণবৎ। এখানেও সকাম ও নিষ্কাম দর্শন হয়। নিষ্কামভাবে দেখিলে শুধু দর্পণখানাই দেখা যায়। ইহাই বিশ্বচিত্ত বা Cosmic Mind. ইহাই সমষ্টি-লিঙ্গ। এই আকাশে সব চিত্তই দেখা যায়; নিজের চিত্তও বটে। এই চিত্তাকাশ দর্শন করিয়া—হইয়া—যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আবির্ভূত হয়। যখন যাবতীয় চিত্তের দর্শন হয়, তখন অবিভক্তভাবেই হয়—শুধু চিত্তাকাশ-রূপে। যখন কোন বিশিষ্ট চিত্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেই চিত্তেরই উদয় হয়।

এইখানে একটি বিচিত্র ব্যাপারের কথা না বলিয়া পারিলাম না। বাহ্যাকাশে যে ভাব ও সত্তার উদয় হয়, তাহা দেশমূলক। অন্তরাকাশে বা চিত্তাকাশে যে ভাব বা সত্তার উদয় হয়, তাহা কালমূলক। অর্থাৎ বাহ্যাকাশে যে গোলাপ-ফুলটি আবির্ভূত হইল, সেই ফুলের অবয়বগুলি **একই সময়ে—যৌগপদ্য-বিশিষ্ট** হইয়া বিন্যস্ত হয়। ইহাই দেশ।

অন্তরাকাশে যদি ঐ ফুলটিই ফোটে, তবে উহার অবয়বগুলি পর পর—in succession—প্রকাশিত হইবে। ইহাই কাল। অন্তরাকাশে যাহা কিছু দেখা যায়, সব চিত্তের—চিত্তাকাশের—বিকার। অর্থাৎ চিন্তাস্বরূপ। ইহা পর পর প্রকাশিত হয়। এই যে চিন্তার এক একটি পূর্বাপর-বিন্যস্ত কালিক ধারা, ইহাকেই এক একটি চিত্ত বলে। অন্তরাকাশে ঐ গোলাপটিও চিত্তের বিকার। অবশ্য বাহ্যাকাশে উহা ভূতের বিকার।

ভূতসৃষ্টির মূলেই একটি দৃষ্টিভ্রম রহিয়াছে। অলাতচক্র=**গোলাকার** আলোক। ইহা কিন্তু নাই। আলো-বিন্দু আছে বটে—তাহাই গতিবিশেষের প্রভাবে গোল দেখা যায়। একই বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত। কিন্তু ক্রম লক্ষ্য না হওয়াতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়। তাই গোল দেখায়। সব আকারই সেইরূপ। যে আবরণে ক্রম দৃষ্ট হয় না, তাহা যদি আমার ২ দিন থাকে ও ঐ গতিও যদি ২ দিন থাকে—তবে দুইদিন পর্যন্ত ঐ গোল জিনিস continue করিবে।

স্থূলদর্শী জীবের নেত্রে ক্রমের তিরোধায়ক আবরণ লাগিয়াই আছে। কাজেই আকারকে স্থায়ী মনে হ'চ্ছে। অবশ্য ওদিকে গতিও চল্‌ছে। যৌগ-পদ্য নাই—কাজেই দেশও নাই, আকারও নাই। সুতরাং বাহ্যজগৎই নাই।

ক্রম আছে—কাল আছে—প্রবাহ বা গতি আছে। এই গতি কালিক গতি—

অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানধারা। ক্ষণিক প্রবাহ আচ্ছন্ন হইলেই জ্ঞান জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হয়। নানা আকারে দেখা যায়।

(২)

নিষ্কল—নিরঞ্জন

চিৎকলা—চিদ্‌বিন্দু = চিদাকাশ = অনন্ত শূন্য = পরমেশ্বর।

চিত্তকলা—চিত্তবিন্দু = চিত্তাকাশ = মহাশূন্য = ঈশ্বর।

ভূতকলা—ভূতবিন্দু = ভূতাকাশ = শূন্য = জীব।

চিত্তাকাশরূপ বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষণ (minimum বিজ্ঞান)-রূপে প্রবাহিত হচ্ছে।

ভূতাকাশরূপে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া অণু (minimum জ্ঞেয়)-রূপে চল্‌ছে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তকলা বাহির হইয়া যেখানে ঘনীভূত হইয়া জন্মিয়াছে তাহাই ভূতাকাশরূপ বিন্দু। এই জমার মূলে ক্রম-তিরোধায়ক আবরণ আছে। এইটি অজ্ঞান বা দেশ। ক্রমভাবী ক্ষণ কখনও বস্তুতঃ সমষ্টিভূত হইতে পারে না,—যৌগপদ্য ভ্রম। সুতরাং ভূতবিন্দুর আবির্ভাব ভ্রমমাত্র।

সেই ক্রম মানিয়া নিয়া ভূত হইতে ভৌতিক জগৎ তৈয়ার হচ্ছে।

ভৌতিক জগতের প্রথম আবরণ সরাইয়া ফেলিলেই দেখা যায় যে তীব্র-বেগে ক্ষণধারা বা কালস্রোত চল্‌ছে। ইহাই জ্ঞানধারা। জ্ঞেয় নাই।

অন্তরাকাশে ৫টি পথ হয়ত আছে। তাই ক্ষণ জ্ঞানধারা ৫ পথে চলছে। ইহা ৫ প্রকার ক্ষণ বিজ্ঞান বা ৫ তন্মাত্র। শব্দ-ধারা = মূল, মধ্য। ৪ ধারা ৪ দিকে। ইহার মূলে একটি ধারা আছে। তাহাই যথার্থ ক্ষণ বিজ্ঞান ধারা, কারণ রূপ জ্ঞান বা রস জ্ঞান নহে। অথচ জ্ঞান।

বাহ্যাকাশেও তদ্রূপ। আকাশ = মধ্য। ৪ ভূত ৪ দিক। আকাশেরও উপরে একটি আছে। তাহাই যথার্থ জ্ঞেয়।

চিদাকাশরূপ বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া চিৎকলারূপে প্রসৃত হচ্ছে। এই ক্ষুব্ধ চিৎকলার সমষ্টিই চিত্তাকাশরূপ বিন্দু। এই সমষ্টির মূলে ক্রমের আবির্ভাবক একটি আবরণ আছে—ইহাই জ্ঞানশক্তি বা কাল। অনন্ত প্রসৃত চিৎকলাতে কালসম্বন্ধ বশতঃ বিন্দুভাব হ'লেই বিরাট্ চিত্ত উৎপন্ন হয়। উহা ক্ষণপ্রবাহী।

১৭/১/৩২

স্বপ্রকাশ চৈতন্যই আছে।

যখন তা হ'তে মহামায়ার স্ফূর্তি হয়, তখন একাংশ দর্শক থাকে, অপর অংশ দ্বিধাবিভক্ত হয়। দ্বিধা বিভাগ হ'লেও মাঝে তৃতীয়ের উদয় হবেই।

দৃশ্য অংশ জ্যোতি ও অন্ধকার—সত্ত্ব ও তমঃ। সত্ত্ব ও তমঃ পৃথক্ হ'লেই—উভয় হ'তে একধারা মিলে। তাহাই রজঃ বা খণ্ডসত্ত্ব, যাহা তমোময়।

১৭/১/৩২

প্রকৃতির দুই স্রোতঃ—সত্ত্ব হ'তে তমঃর দিকে ও তমঃ হ'তে সত্ত্বের দিকে। সত্ত্ববিন্দু তমোগর্ভে পতিত হইয়া ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই বিকাশের পথে জন্মমৃত্যুর দ্বারাই অগ্রসর হয়। মৃত্যুর পরে এগিয়ে যাচ্ছে।

মানুষে এসে স্রোতঃ বন্ধ হয়ে যায়।
প্রথম জন্ম হ'য়েছে অবিদ্যা প্রকৃতিতে।
দ্বিতীয় জন্ম হয় বিদ্যা প্রকৃতিতে।
তৃতীয় জন্ম হয় চৈতন্য প্রকৃতিতে।
প্রথম জন্মদাতা = ঈশ্বর = পিতা।
দ্বিতীয় জন্মদাতা = সদাশিব = গুরু।
তৃতীয় জন্মদাতা = চৈতন্য = চৈতন্য।

২৩/১/৩২

সব তত্ত্বেরই অভাব আছে—তাই অতৃপ্তি আছে। ভাব দ্বারা তা পূর্ণ হয়। তৃপ্তি আসে। এই অভাব বোধই পিপাসা। যতক্ষণ অভাব আছে—ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি, চঞ্চল, negative. অভাব মিটিলেই পুরুষ।

২৭/১/৩২

আমরা যে কোন জিনিস দেখ্ছি তা আলোকের মধ্যেই দেখ্ছি। জিনিস আলোকেরই এক একটা আকার মাত্র। এই আকারটি ডুবাইয়া শুধু আলোটি দেখা যাবে।

আকার ডুবাইবার একটি রহস্য আছে।—বিক্ষিপ্ত অবস্থায় একটি আকার ডুবান যায় না। আপেক্ষিক ভাবে অভিভূত করিলেও অন্য আকার তার স্থান দখল করে। ইহাই স্বপ্ন। বস্তুতঃ সব আকার এক আকারে লীন হওয়া প্রথমে আবশ্যক। তা হ'লেই ঠিক যে আলোক এখন তা থাক্বে না। একটা ঘনীভূত আলোক পাওয়া যাবে—যাতে ঐ একটি আকার ভাস্ছে। বস্তুতঃ ঐ আলোকটিই আমার বর্তমানের আলোক। সব দেশকে গুটাইয়া আনিলেই কালও গুটাইয়া আসে। তখন স্মৃতি ও আশা এক হইয়া যায়।

এখন ঐ আকারটি ডুবাইয়া দিলেই বিশুদ্ধ জ্যোতি পাওয়া যাবে। এই জ্যোতিতে ইচ্ছানুসারে আমার অতীত ও অনাগত দেখা যাবে—অন্যের নহে। যে আলোকে আমার নিজের জীবন ভেসে চল্ছে, ইহা সেই আলোক; অবশ্য

বিশুদ্ধ। ইহার পরেই অন্ধকার। যখন এই অন্ধকারকে দেখতে পাওয়া যাবে, তখন তাকে দুই ভাবে দেখতে পাওয়া যাবেঃ—

১। এক অন্ধকারমধ্যে খদ্যোতবৎ ঐ পূর্বজ্যোতি। ঐ রূপ, অসংখ্য জ্যোতি।

২। শুধু অন্ধকার মাত্র; অন্ধকারের পরেই আবার একটা আলোক আছে—সেই আলোকেই সমগ্র জগৎ ভাস্‌ছে।

সে আলোক দেখাও দুই প্রকার।—

১। আলোকে জগৎ দেখা—দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীবৎ বিশ্বদর্শন।

২। শুধু আলোক দেখা।

পূর্বের আলোকটাকে জ্ঞানজ্যোতি বলি। ইহা আত্মার জ্যোতি। এইটিকে চৈতন্যজ্যোতি বলি। ইহা পরমাত্মার জ্যোতি।

পূর্বোক্ত জ্ঞানজ্যোতির পর ও চৈতন্যজ্যোতির পূর্বে একটি জ্যোতি আছে—তাহা জীবাত্মার সমষ্টিভাব হ'তে বা পরমাত্মার ব্যষ্টিভাব হ'তে হয়—অর্থাৎ এক—জীবজ্যোতি—ব্রহ্মাণ্ডজ্যোতি।

চৈতন্যজ্যোতির পরে বিরাট্ শূন্য।

২৭/১/৩২

যে কোন শব্দ শোনা যায় বা রূপ দেখা যায়, ইত্যাদি—সব শক্তির বিকিরণ। সেটাকে ঘনীভূত করলেই Source-টা ধরা পড়ে। তখন শুধু একটা নয়—সবটাই আয়ত্ত হয়।

যেমন দূর হ'তে একটা আওয়াজ শোনা গেল। সেটাকে ঘনীভূত করিবা-মাত্র যে আওয়াজ করেছে, তাকেও দেখা যাবে। ইত্যাদি।

শব্দের সঙ্গেই রূপ ভাসে—যে বল্‌ছে ও যাহা বল্‌ছে। যদি শব্দ শোধিত হয়। যে শব্দ আমরা শুনি তাতে বাহ্য ভাব মিশ্র হয়—কারণ শব্দটা বাইরে আস্‌ছে। যদি আমি পূর্ব হইতেই বাহ্য উপাদান আমার ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখি, তাহা হইলে অথবা পরে বাহ্য উপাদান সরাইয়া নিলে বিশুদ্ধ বা সংস্কৃত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। যে শব্দ করছে, তাতে তাকেও দেখা যায়—যে বিষয়ে শব্দ করছে অর্থাৎ যে চিন্তা দ্বারা শব্দ প্রবর্তিত হয়েছে তা-ও দেখা যায়।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থটি ভাসে।

শব্দ হ'তে প্রত্যক্ষই হয় বটে, তবে দুইটি condition আছেঃ—

(ক) শ্রোতা বিশুদ্ধ হওয়া চাই। নতুবা শ্রোতাকে স্পর্শ করিয়া শব্দ মলিন হইয়া—আবৃত হইয়া—যায়।

(খ) বক্তা বলার সময় অর্থ-সাক্ষাৎকার করা চাই। অন্ততঃ স্মরণ। শ্রোতা শুদ্ধ হ'লে বক্তার অর্থ স্মরণ হতেও শ্রোতার প্রত্যক্ষ হ'তে পারে। তবে শ্রোতা সাধারণ হ'লে বক্তার প্রত্যক্ষদর্শন তৎকালে আবশ্যক—তা না হ'লে ভবিষ্যতে শ্রোতার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব।

২৮/১/৩২

সকলেরই ক্ষুধা আছে—যেমন দেহের, তেমনই ইন্দ্রিয়াদির। তাই সকলেরই আহার চাই। ক্ষুধাবোধ না হওয়া পর্যন্ত জড়ত্ব—রোগবিশেষ। ক্ষুধাবোধ হইলে যা তা খাওয়াতে রোগের বৃদ্ধি হয়।

আহার সকলেরই চাই। চক্ষুর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তার ভোগ্য রূপ দাও—তবে সে ক্ষুধা মিটিবে। রূপবিশেষে ক্ষুধা মিটে বটে, তবে আবার ক্ষুধা হয়। এইরূপ সর্বত্র জানিবে।

এই ক্ষুধা হওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভিতরে ক্ষুধা, বাহিরে তার অন্ন। ক্ষুধা থাকিলেই তার যোগ্য অন্ন আছে, বুঝিতে হইবে। যে অন্ন আমরা খাই, তাহা শুদ্ধ নহে—তাই ভিতরে তার শোধন হয়। সার—সত্ত্ব—নেওয়া হয়, অসার বাহির করা হয়। রূপেও তাই,—যে রূপ দেখি, তার যেটুকু আমার চক্ষের পোষক, সেটুকু প্রকৃতি নিয়ে নেয়, বাকিটুকু বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ নিরন্তর হচ্ছে—তাই চক্ষুর জীবন চল্‌ছে।

চক্ষুর ক্ষুধা অনন্ত নয় ব'লে, তার আহারও অনন্ত নহে। যদি তাই হ'ত তা হ'লে জগতের সান্ত রূপে সে আকৃষ্ট হ'ত না, তৃপ্তও হ'ত না। যখন ক্ষুধা বস্তুতঃই এমন প্রবল হয় যে, আর কোন রূপেই তাহার নিবৃত্তি হয় না, ক্ষণেকের জন্যও না, তখন সেই অমৃত-রূপ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবে। তাতেই তার তৃপ্তি হবে। সে রূপে অসার নাই—তাই তাহা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য।

এমন অমৃত আছে যা চক্ষুর কাছে নিত্য-রূপ, কর্ণে নিত্য-সঙ্গীত—ইত্যাদি। যার যার ক্ষুধা আছে, সকলকেই সে তর্পিত করে। সেই অমৃতই অভাবের ভাব।

মহা অভাবের		—		মহাভাব।	
= কাম		=		আনন্দ	
যে প্রকার কাম		সে		প্রকার	আনন্দ।
চিকীর্ষুর	নিকট	সে	অমৃত	=	ক্রিয়াশক্তি।
জিজ্ঞাসুর	"	"	"	=	জ্ঞানশক্তি।
কারণ, কামীর	"	"	"	=	ইচ্ছাশক্তি।
প্রথম	ভূমিতে	তাহা	কর্ম	—	সিদ্ধি ঐশ্বর্য্যভোগ।

দ্বিতীয়	ভূমিতে	তাহা	জ্ঞান	—	কৈবল্য, মোক্ষ।
তৃতীয়	ভূমিতে	তাহা	ভক্তি	—	প্রেম।

২৮/১/৩২

প্রণবের দ্বারা বীজ ঘেরা থাকে। প্রণব = শব্দ। এই মূল শব্দ বীজকে ঢেকে রাখে। শব্দের আবরণ একটু সরাইয়া দিতে হয়—তবে ত' বীজ ফোটে—প্রকাশকালকে পায়। বীজ = অব্যক্ত চৈতন্য বা শক্তির অব্যক্ত অবস্থা। তার আবরণ হচ্ছে শব্দব্রহ্ম। শব্দাবরণ না থাকিলে সে থাকিতে পারে না। শব্দাবরণ বরাবরই থাক্‌বে। তবে একটু ফাঁক ক'রে দিলেই অব্যক্ত চৈতন্য অভিব্যক্ত হ'তে থাক্‌বে।

বীজদাতা গুরু। বীজ = শব্দাবৃত চৈতন্য। বেদ, মন্ত্র।

ফলদাতা গুরু। ফল = শব্দমুক্ত চৈতন্য। দেবতা।

বীজ ও ফলের মাঝখানে কর্ম। বীজ পেলে তবে কর্মপ্রারম্ভ—কর্মের অবসানে ফল। কর্মের উদ্দেশ্য চৈতন্য হ'তে শব্দকে সরাইয়া লওয়া। সাধনামাত্রেরই তাই উদ্দেশ্য। ইহাই পুরুষকার।

৩/২/৩২

তাঁর সমান তিনি—আর কিছু হ'তে পারে না।

সুতরাং কোন উপায়ে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে না। যদি যেত তা হ'লে উপায় তাঁর সমকক্ষ হ'ত।

তিনি স্বতন্ত্র—তাই কিছুতেই তাঁকে ধরা যায় না; যদি তিনি নিজে ধরা না দেন।

কর্মদ্বারা ঠিক তাঁকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বিভূতি। জ্ঞান দ্বারা পাওয়া যায় আত্মা। ভক্তি দ্বারা পাওয়া যায় পরমাত্মা।

তাঁকে দিয়াই তাঁকে পাওয়া যায়। কারণ তাঁর মূল্য নাই। ইহাই কৃপা বা অনুগ্রহ। যিনি অনুগ্রাহক তাঁর সঙ্গে bartering চলে না। এমন কি সম্পৎ আছে যা দিয়া প্রতিদানে অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে? অনুগ্রহ বিক্রয় হয় না।

৬/২/৩২

চৈতন্য সকল ও নিষ্কল দুই-ই।

নিষ্কল চৈতন্যই পরমপদ।

সকল চৈতন্যই পরমেশ্বর। এখানে অনন্তকলা মহাবিন্দুরূপে।

জ্ঞানেরও পরমাণু আছে, চৈতন্যেরও পরমাণু আছে; সকলেরই পরমাণু আছে।

যাহা হইতে যাহার উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই তাহার প্রকাশ হয়। যে আলোকে এ জগৎ উৎপন্ন, সে অলোক ভিন্ন এ জগৎ দেখা যাবে না।

চৈতন্য এক আলোকে কলা দেখা যায়।

বিদ্যা অন্য আলোকে গুণ দেখা যায়।

বুদ্ধি অন্য আলোকে অণু দেখা যায়।

১৯/২/৩২

দীপ-কলিকাটি দেখিতেছি। চারিদিকে প্রভা ছড়াইয়া গিয়াছে। এই দেখা ঠিক দেখা নহে। কারণ, দীপপ্রভা বিক্ষিপ্তাবস্থায় আছে। এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলি উপসংহৃত হইয়া দীপ-কলিকাতে ফিরিয়া আসিলে চারিদিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাকে অন্ধকার বল, আর শূন্য বল—সমান কথা। তখন দীপ-কলিকা একাগ্র হইয়াছে—বলা যায়। সেই সময়কার দর্শন খাঁটি দর্শন। তাহাতে বাহ্য জিনিসের মিশ্রণ নাই। যদি এটা স্থায়ী হয়ে যায় তা হ'লেই দীপ-কলিকা বজ্রভাব প্রাপ্ত হইল—বলা চলে। এই অবস্থায় তাকে কেহ নিভাইতে পারে না। তাহার মৃত্যু নাই। কারণ, মৃত্যু বাহ্যবস্তুর ঘাত-জনিত আবরণ—যাহা বিশুদ্ধ, যাহার সঙ্গে বাহ্য জগতের মিশ্রণ নাই ও হতে পারে না, তাহার মৃত্যু হয় না।

তবে কথা এই—তা হ'লে আমিই বা দেখ্‌ব কি ক'রে? ইহার উত্তর—আমিও তখন বজ্রভাবাপন্ন। আমার ইন্দ্রিয়সকল মনের বিক্ষিপ্ত প্রভা। তখন ইন্দ্রিয়সকল উপসংহৃত হইয়া মনে ঘনীভূত হইয়াছে। মন বজ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার মনই ঐ প্রকার দীপ-কলিকা দর্শনে সমর্থ। যদি সত্যই কেহ দীপ-কলিকাকে ঐ প্রকার করিয়া দেয়, আর আমি দ্রষ্টা হইয়া সম্মুখে থাকি—তা হ'লে আমার মন ও ইন্দ্রিয়কে টানিয়া লইয়া বজ্রাবস্থা আপনা আপনিই প্রাপ্ত হইবে। সে জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তবে সে রকম করা উচিত নয়; কারণ, হঠাৎ বিক্ষিপ্ত রশ্মি গুটাইয়া আসিলে ভয়ঙ্কর nervous shock লাগিবে এবং ঐ বজ্রদীপ দর্শনমাত্রই মোহ আসিবে। কারণ আমি বোধ রাখিতে পারিব না। এইজন্য মনকে শনৈঃ শনৈঃ তৈয়ার করিতে হয়। মন দৃঢ় হইলে সে ভয় নাই। তখন বজ্রমনের সঙ্গে বজ্রদীপের যোগ হয়—শুধু বজ্রদীপ কেন, যা দেখা যায়, তাহাই বজ্রময়। তখন এখনকার মতন বহু জিনিস দেখা যায় না। যেটা ও যতটুকু গ্রহণ করা যায় বা করার ইচ্ছা হয়, ঠিক তাহা ও ততটুকুই দেখা যায়। কারণ, তখন বিক্ষেপ থাকে না

বলিয়া একদিকে যেমন মনের বিকল্প থাকে না, অন্যদিকে বস্তুতেও মিশ্র-ভাব থাকে না। যখন যাহা দেখা যায়, তখন তাহাই মাত্র দৃশ্য।

এই বজ্রাবস্থার অনেক রহস্য আছে। মন বজ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইলে চারিদিকে কি দেখা যায়? কিছুই না। শুধু নিজেকেই দেখা যায়। বজ্রই আত্মা। মন নিজেকেই নিজে দেখে। ইহাই প্রজ্ঞা।

দেহাদি থাকা পর্যন্ত কিন্তু উহাতে স্থিতি হয় না। দর্শন হয় মাত্র। দর্শন মানে = উহার সহিত স্বপ্রকাশ তাদাত্ম্য। চেতনাময় ঐক্য। উহা হইতে আবার নামিয়া আসে।

ঐ দর্শন কিরূপ? যতদিন সংস্কার থাকে, ইচ্ছা থাকে, ততদিন তাহারই আকার। তদভাবে অব্যক্ত। ইচ্ছাসহকারে মনকে বজ্র বা আত্মভূমিতে লইয়া গেলে ইচ্ছার প্রকাশকালকে পাওয়া যায়—তদাকারে আত্মদর্শন হয়। সেখানে কিন্তু ইচ্ছা বা সংস্কার থাকে না; কারণ, তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তিকে নামাইয়া আনিতে পারিলেই সৃষ্টি হয়। নামাইবারও কৌশল আছে।

আত্মা বা বজ্র অব্যক্ত। ইহা নিরাকার বা অনন্ত আকারময় বা অবর্ণনীয়। ইচ্ছাকে ঐখানে নিয়া গেলেই ইচ্ছার জ্ঞানে লয় হয়, তখন সাক্ষাৎকার হয়। পরে ক্রিয়াশক্তিরূপে নামাইতে হয়। ইচ্ছাকে লিঙ্গ ও সংস্কারক্ষেত্র হইতে উঠাইতে উঠাইতে—শোধিত করিতে করিতে—ঘনীভূত করিতে করিতে—শুদ্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত করিতে হয়। ইহা শুদ্ধ আকার। এই শুদ্ধ জ্ঞান-রূপা ইচ্ছাকে—আকারকে—নামাইলেই সৃষ্টি হইল।

ক্রম এইরূপ—

১। সাধারণ অবস্থা—অহঙ্কার আছে—আমি কর্তা ও ভোক্তা। ঈশ্বর অসিদ্ধ। বর্তমান কর্মই কর্ম। সেটা আমার ইচ্ছা মাত্র।

২। উন্নত—অহঙ্কারের তীব্রতা কমিলে মোহ কমিয়া আসে। তখন দেখা যায় আমিই কর্তা বটে, তবে সে আমিটা শুদ্ধ বর্তমানে সীমাবিশিষ্ট নহে।

আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা বাধিত হয়—অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিহত হয়। কে বাধা দেয়? দ্বিতীয় আর কে আছে? আমিই আমাকে বাধা দিই। আমার পূর্বকর্ম—সংস্কার—আমার বর্তমান কর্মে বাধা দেয়। ইহাই আমার প্রকৃতি। এই সময়ে পুরুষকার আছে, প্রকৃতিও আছে। প্রথম অবস্থায় মোহবশতঃ প্রকৃতির সত্তায় দৃষ্টি পড়ে না। যতই জ্ঞান বাড়ে, ততই অজ্ঞানের সন্ধান ভাল করিয়া পাওয়া যায়।

৩। ইহার পর কর্তৃত্ব কেটে যায়—তখন দেখি যে, আমি কর্তা নহি, কেবল দ্রষ্টা মাত্র। যা কিছু করে, প্রকৃতি। যদিও সে আমার প্রকৃতি, তথাপি

অহংভাব না থাকাতে মমত্ব থাকে না। তাই আমার বলিয়া ঠিক বুঝা যায় না। বাহ্য প্রকৃতিই তখন বলা উচিত।

৪। ইহার পরে প্রকৃতির কর্তৃত্ব আর আছে বলিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়াই তখন আর ব্যক্ত নাই।

৫। ভগবানের কৃপা হ'লে—তখন দেখা যায় তিনি কারয়িতা, আমি কর্তা। তবে এ কর্তৃত্বে ভয় নাই—বন্ধন নাই। কারণ ইহা দাসত্ব; দাসের হুকুম তামিল করা মাত্র। এ অবস্থায় আমি দ্রষ্টা ত' থাকিই, অথচ কর্তাও হই (অবশ্য ভগবানের প্রেরণায়)। তিনি প্রভু, নিয়ামক,—আমি নিয়ম্য—এ বোধ থাকে। ইহা আশ্রিতভাব। আমি কি দেখি—দেখি, তিনি সর্বাধারে সব করাচ্ছেন। আমি যা করি, বলি—মূল তিনি। অপরেরও বলা, করারও মূল তিনি। সমগ্র জগতের সমস্ত ক্রিয়াই তাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণামূলক, ইহা দেখা যায়।

পাপ-পুণ্য এ অবস্থায় থাকে না।

৬। ক্রমে তিনিই যে একমাত্র কর্তা, তাহা দেখা যায়। আমি দেখ্‌ছি, তিনি করছেন। ইহাই নাটক—অভিনয়। লীলার সূত্রপাত। আমি দ্রষ্টা, তিনি অভিনেতা। তিনিই সাক্ষাৎভাবে অনন্ত সাজে অভিনয় করছেন। কেন? আমাকে দেখাবার জন্য। আর কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্মা—তাহা দেখা যায়।

ইহাই ভক্তির স্তর। আমি দেখি বটে, কিন্তু দেখিয়া আনন্দ পাই। তাঁহার লীলাদর্শনজনিত আনন্দ। পূর্বে আশ্রিত হইয়া দর্শকভাবে না থাকিলে এ লীলানন্দ সম্ভোগ হয় না।

৭। পরে দেখি, তিনি আর কর্তা নাই। তিনিও দ্রষ্টা হইয়াছেন। আমি তাঁকে দেখছি—তখন বাহ্যলীলা নাই। আর তিনি আমাকে দেখ্‌ছেন। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছি। ইহাই প্রেম। তাঁহা হ'তেও লহর উঠ্‌ছে। আমা হ'তেও লহর উঠ্‌ছে,—পরস্পর মিল্‌ছে।

৮। ইহার পর আলিঙ্গন—সম্ভোগ-শৃঙ্গার।

৯। ইহার পর রসস্থিতি।

২১/২/৩২ (রাত্রি)

মহাবিন্দু হ'তে চারিদিকে প্রভা ছড়াইতেছে। এই প্রভামণ্ডলই তাঁর রাজ্য। এখানে তাঁর আকর্ষণ। যে এর মধ্যে এসে পড়ে, তাকেই তিনি টানেন—তাঁর টান অহেতুক। তবে এসে পড়া চাই।

উপাদান যতই নির্মিত হয়, ততই কলাপ্রকর্ষ হয়—কলা পূর্ণ হ'য়ে বিন্দুভাব প্রাপ্ত না হ'লে তাঁর টান বুঝা যায় না। তাঁর জ্যোতি, কৃপা,

আকর্ষণ—বিন্দুর উপর সর্বদাই আছে। তবে বিন্দুভাব না হওয়া পর্যন্ত সেটা টের পাওয়া যায় না।

কলা বৃদ্ধি হ'তে হ'তে নিজের মধ্যকার সমস্ত কলার সমষ্টি হ'লেই বিন্দু নির্মাণ হয়। তখন তাঁর সত্তা উপলব্ধি হয়। বিন্দু গাঢ় না হ'লে তাঁকে ধরা যায় না। ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্যও তাই—কলার বিকাশ। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে জ্ঞান পাওয়ার আশা নাই।

যে সাধক পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতি বা কলার বিকাশে সাহায্য করিতেছেন, তিনি অগ্রসর হইতেছেন। তবে ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারেন না। নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। মহাবিন্দুর আকর্ষণ-ক্ষেত্রের বাহিরে থাকা পর্যন্ত কিছু বুঝিতে পারে না। পরে হঠাৎ ধপ্ করিয়া প্রকাশ খুলিয়া যায়।

২৮/২/৩২ (৮-২০ প্রাতঃ)

প্রতিবিম্ব সর্বত্র ব্যাপক। প্রকাশক আধার ভিন্ন তাহার অভিব্যক্তি হয় না। বস্তুতঃ বিম্ব কাল ও দেশের অতীত। দেশ, কাল ও নিমিত্তের যোগাযোগ হইলেই তাহার অভিব্যক্তি হয়। জগতে আমরা যে সকল জিনিস দেখতে পাই, তাহাও প্রতিবিম্ব—বিম্ব নহে।

ধর গোলাপ। মূল গোলাপ অব্যক্ত। তাহার নিত্য অভিব্যক্ত রূপই শাক্ত গোলাপ। ইহা শাক্তরূপ—চৈতন্যময়। ইহা নিত্যরূপ। অথচ ইহাও কিন্তু আভাস। এই শাক্ত গোলাপ মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহা বৈন্দব গোলাপ। ইহার আভাস গোলাপ।

এই বৈন্দব বা আভাস গোলাপ মহাকাল ও মহাদেশে বর্তমান। ইহার কাল বর্তমান ক্ষণ, দেশ এখানে।

এই আভাস মায়াগর্ভে পতিত হইয়া মায়িক বা বিবর্ত গোলাপে প্রকাশিত হয়, আভাস যথাবৎ থাকে, অথচ মায়িক গোলাপের আবির্ভাব হয়।

এই মায়িক গোলাপ গুণক্ষেত্রে পতিত হইয়া প্রাকৃতিক গোলাপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহা কঞ্চুকী পুরুষের ভোগ্য।

ইহা বুদ্ধিতে নামিয়া বৌদ্ধ—সাত্ত্বিক—গোলাপের সৃষ্টি করে।

বৌদ্ধ গোলাপ অহঙ্কারে নামিয়া রাজস বা আহঙ্কারিক গোলাপের সৃষ্টি করে।

রাজস গোলাপ তন্মাত্রায় নামিয়া তান্মাত্রিক বা তামস গোলাপের সৃষ্টি করে।

তামস গোলাপ স্থূলভূমিতে পড়িয়া ভৌতিক বা স্থূল গোলাপের সৃষ্টি করে—যাহা পরমাণ্বারব্ধ। ইহা আরম্ভ। পঞ্চীকৃত গোলাপ।

১৩/৩/৩২ (রাত্রি ৮টা)

(১)

তেজকে জাগাইয়া চক্রে চক্রে উঠাইয়া আজ্ঞাতে আনিলে যখন পঞ্চাশটি বর্ণ পূর্ণ হইয়া যায় তখন তেজোময় লিঙ্গশরীর স্থূল হইতে আল্‌গা হইয়া পড়ে, শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থায় লিঙ্গ স্থূল হইতে বাহির হইতে পারে না। অবশ্য শুদ্ধভাবে। সাধারণ মনুষ্যের লিঙ্গ স্থূলের সহিত জড়িত হয়ে রয়েছে। ষট্‌চক্রের সাধনা এই জড়িত ভাবকে ভেঙ্গে লিঙ্গকে আলাদা করার জন্য। দেহের সার দেহ হ'তে বাহির করা আবশ্যক। পরে যখন দেহে থাক্‌বে, সে আল্‌গা হ'য়ে থাক্‌বে। বন্ধনটা ঢিলা হ'য়ে যাবে। এইভাবে তৈজসত্ত্ব ও আল্‌গাভাব না হ'লে উপাসনা হয় না—সহস্রারের পথে চলা যায় না।

সাধনাক্রমে লিঙ্গশরীর ধীরে ধীরে নির্মিত—অর্থাৎ অভিব্যক্ত—হ'তে থাকে। তখনও তাহা দৃশ্য, এই স্থূলাবচ্ছিন্ন আমিই দ্রষ্টা। পরে যখন নির্মাণ পূর্ণ হয় তখন চট্ করে তাতেই অভিমানটা লেগে যায়, তাই দ্রষ্টা হয়—স্থূলশরীর দৃশ্য হ'য়ে পড়ে। বস্তুতঃ তখন লিঙ্গও দৃশ্য হয়। অর্থাৎ ক্রমশঃ এমন ক্ষমতা হ'তে থাকে যাতে লিঙ্গকে বিভাগ করা যায়—এক অংশ আলাদা হ'য়ে দ্রষ্টা হয়, বাকী অংশ দৃশ্য হয়।

সৃষ্টির পরেই অনুপ্রবেশ হয়।

সৃষ্টি করে কে? করে প্রকৃতি। কোথা হ'তে? যোনি হ'তে। অনুপ্রবেশ করে কে? করে পুরুষ।

লিঙ্গ ←→ যোনি
↓ ↓
লিঙ্গাংশ ←→ দেহ
বা ↓
জীব দেহী

(২)

কাম, ক্রোধ, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, অ-জ্ঞান প্রভৃতি সকলেরই উপাদান আছে। সবই সৃষ্টিকালে সাকার—ইহাদের আকার আছে। কলা পূর্ণ হ'লেই পূর্ণ আকার উপলব্ধ হয়। কামকলা পূর্ণ হ'লে কামের নিত্য-রূপ অভিব্যক্ত হবে,—এইরূপ সর্বত্র। তবে দেশকালের ভেদে তা'দের নৈমিত্তিক রূপের ভেদ হইতে পারে। কামাদির বীজ আছে—তাহাকে energise করিলে সজাতীয় কলাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। কলা পূর্ণ হ'লে বিন্দুরূপে স্বরূপের প্রকাশ হয়।

২০/৩/৩২

আমার দেখা scheme এই প্রকার—

পূর্ণ ও তার স্বভাব

এই স্বভাববশতঃ নিরন্তর অব্যক্ত হ'তে অসংখ্য চিদণু স্খলিত হইয়া তমোগর্ভে পড়িতেছে। শরীর গ্রহণের জন্য পড়ছে। শুদ্ধ জড়ে চৈতন্যের প্রতিফলন হয় না।

চিদণু কি? চৈতন্য-সত্তা নিষ্কল ও ব্যাপক এবং অসঙ্গ। সত্ত্বাংশ যেখানে আছে, সেখানেই তাহা প্রতিফলিত হয়। তাহাই চিদণু।

অখণ্ডসত্ত্ব আছে। তাতে অনন্ত সত্তাংশ আছে—বিলীনভাবে মিশিয়া আছে। সত্ত্ব ভাঙ্গিয়া সত্ত্বাংশ হয় না—অখণ্ডসত্ত্ব ভগ্ন হয় না। এগুলি নিত্য অংশ। তবে মিশিয়া থাকাতে জানা যায় না। অখণ্ডসত্ত্বে চৈতন্য নিত্য দেদীপ্যমান। ইহাই পরমেশ্বর। অখণ্ডসত্ত্ব = মহাবিন্দু। ক্ষোভবশতঃ সত্ত্বাংশ সত্ত্ব হইতে বহির্ভূত হয়। বাহিরেই ত' আঁধার। তাই সত্ত্বাংশ সত্ত্ব হইতে পৃথক্ হ'লেই আঁধারে প্রবিষ্ট হয়।

একপ্রান্তে শুদ্ধসত্ত্ব, তাতে আঁধার নাই। অপর প্রান্তে শুদ্ধতমঃ, তাতে আলোক নাই। চৈতন্য সর্বত্রই আছে। তবে শুদ্ধ আঁধারে চৈতন্যের প্রতিফলন নাই। জ্ঞানজ্যোতি নাই। তাহাই জড়।

এইখানে একটি রহস্য দেখিতে পাইতেছি—

অলিঙ্গ সত্ত্ব ও অলিঙ্গ তমঃ বস্তুতঃ অভিন্ন। কিন্তু ক্ষোভবশতঃ যখন মেরুদ্বয়ের বিকাশ হয়, তখন একদিকে লিঙ্গের অপরদিকে যোনির আবির্ভাব হয়। ইহাই অদ্বৈত হ'তে পুরুষ-প্রকৃতির আবির্ভাব।

২৪/৩/৩২

আজ বুঝলাম চৈতন্যকে ঘিরে রয়েছে—শুদ্ধসত্ত্ব। ইহাই বিন্দু (= মহা-মায়া)। ক্ষোভ হয় বিন্দুর—তরঙ্গগুলি নাদ ও কলা বা অণু। তেমনি শুদ্ধ-তমোরও (= মায়া) ক্ষোভ হয়—তরঙ্গগুলি ভূতাণু বা particles of matter.

২৭/৩/৩২

নিষ্কল আছে—স্থির, ধ্রুব। তাতে ঘেরে একটি চক্র নিত্য ঘুরছে। রাধা-চক্র। আমার মনে হয়—ইহাই পরাশক্তি। নিষ্কল = শান্তি।

রাধাচক্র = অনন্তগতি; সুতরাং তাহাও স্থির মনে হয়। তবে বাহির হইতে দেখিলে তাহা ভয়ঙ্কর গতিশীল দেখা যায়। এই গতিই জগৎকে গতি-শীল, চেতন করছে। রাধাচক্র দক্ষিণাবর্তে ঘুরছে। কেন ঘুরছে তার কারণ

নাই। অহেতুক। ইহাই আরাধনা। স্বাভাবিক। এই চক্র ভেদ করলে তবে জগতের বাহিরে যাওয়া যায়।

ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির মেল না করিয়া যদি ব্যষ্টি রাধাচক্রের বাহিরে যাওয়া যায়, তাহা হইলে দেহত্যাগ হয়—আতিবাহিক ভাব পাওয়া যায়। সূর্য পর্যন্ত ঘোরা-ফেরা যায়। কিন্তু জগতের বাহিরে যেতে হ'লে জগতের রাধা-চক্র ভেদ করতে হবে। এই যে চক্র ঘুরছে। ইহা হইতেই চৈতন্য, জ্যোতি ও নাদ ছড়াইয়া যাচ্ছে। সুতরাং রাধাচক্র বিন্দু বা শুদ্ধসত্ত্ব।

১৫/৪/৩২

যথার্থ বোধ বড় কঠিন। শুদ্ধ আমি বোধ জাগিলেই ইচ্ছার নিবৃত্তি হইবে।

ইচ্ছার নিবৃত্তি হইলে 'আমি'-বোধ জাগিবে। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে। জগতের সকল ইচ্ছাই এক ইচ্ছার বিকাশ। এই ইচ্ছাটি না গুটাইলে বোধ—দর্শন—হ'তে পারে না। সুতরাং আত্মদর্শন যখন হয়, তখন আর ইচ্ছার বিকাশ থাকে না। যে ইচ্ছার অধীনে আমি ও আমার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা সংহৃত না হ'লে ইচ্ছার মূল সত্তার দর্শন হওয়ার উপায় নাই। ইচ্ছা হ'তেই সৃষ্টি-লীলা। ইচ্ছার পশ্চাতে সত্তা। দর্শন হ'লেই—ক্ষণেকের জন্যও ইচ্ছারোধ হয়।

দর্শন স্থায়ী হ'লে উহাই স্থিতি—তাহা বড় কঠিন। প্রথমেও যাহা, অন্তেও তাহাই। প্রথমটি দর্শন, অন্ত্যটি স্থিতি। প্রথমটি ক্ষণচৈতন্য, অন্ত্যটি নিত্যচৈতন্য।

সব যখন লীন হয়, তখন আবার ইচ্ছার স্ফুরণ হ'তে পারে,—তাহা নবীন সৃষ্টি। এই ইচ্ছার স্ফূর্তি স্বভাব হ'তেই হয়। তবে এ ইচ্ছা হ'তে জগৎ সৃষ্টি হ'তে পারে না। বোধের বা দর্শনের অনুপাতে ইচ্ছার বলাবল। বোধ পূর্ণ হ'লে—দর্শন স্থিতিতে পরিণত হ'লে—সেখান হ'তে যে ইচ্ছা, তাহা হ'তে সমগ্র সৃষ্টির আবির্ভাব হয়; নতুবা আংশিকভাবে হয়।

সৃষ্টিরহস্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে বোধের বা দর্শনের নিদর্শন কি ?

১৯/৫/৩২ (হরিদ্বার)

কারণ = ভাব; যাহা মানুষের মুখে স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে প্রকাশ পায়। তখন প্রাণ জাগ্রৎ থাকে—তাই জীবন থাকে। মন ও ইন্দ্রিয় নিদ্রিত থাকে। তখনকার অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিমান না থাক্‌লে ভাব বা expression থাক্‌ত না। ভাবের অতীত = expressionless. কারণ-ভূমি ইচ্ছাময়।

লিঙ্গ = জ্ঞান; যাহা স্বপ্নাবস্থায় প্রকাশ পায়। তখন মন জেগে থাকে—প্রাণ ত' থাকেই। বস্তুতঃ প্রাণের চলন অবস্থাই মন। ইহা হ'তেই স্বপ্ন বা স্বপ্নবৎ বোধ হয়। তখন ইন্দ্রিয় নিদ্রিত। এই সময় অভিমান লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

স্থূল = ক্রিয়া; যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় প্রকাশ পায়। তখন ইন্দ্রিয় জেগে থাকে—প্রাণ ও মনও থাকে। প্রাণের চলন হ'তে নানাকারে বিষয়-প্রতিভাস হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়ের কাজ। এই সময়ে অভিমান স্থূলদেহকে ধরে আছে। ইন্দ্রিয় জাগা থাক্‌লে স্থূলদেহ প্রকাশ পায়। স্থূলদেহের অতীত হ'তে হ'লে ইন্দ্রিয়কে ঘুমাইতে হয়। ভিন্নদিগ্‌বাহী ইন্দ্রিয়-প্রবাহকে গুটাইয়া এক জায়গায় আনিলে বাহ্যজগৎ লোপ পায়, স্থূলদেহের বোধও থাকে না। একগ্রতার পূর্ণতায় একটা জ্যোতি প্রকাশ পায়। ইহা শুদ্ধমন—ইহা দ্বারা চারিদিকে একটা ব্যাপক জ্যোতি ছড়াইয়া আছে—দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয়দ্বারা যেমন রূপরসময়—বিষয়াত্মক—জগৎ দেখা যায়, তদ্বৎ শুদ্ধমনের দ্বারা ব্যাপক জ্যোতি দেখা যায়। কিন্তু এ জ্যোতি কোথা হতে আসছে, তা দেখা যায় না। এই মনই তখন আত্মা—দ্রষ্টা। জ্যোতি তখন দৃশ্য। এই সময়ে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়। ভৌতিক জগৎ দেখা যায় না। এই অবস্থার জগৎ জ্যোতির্ময়—প্রতিভাসময়। এই জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় আকার—বস্তুতঃ ভাবেরই বাহ্যপ্রকাশ। কিন্তু তা বুঝতে পারা যায় না।

মনকে স্তম্ভিত করিয়া শুধু প্রাণকে জাগাইয়া রাখিলে অভিমান কারণ-দেহকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় প্রাণ বা কারণশরীরই আত্মা—দ্রষ্টা। আর দৃশ্য = ভাবরাশি। দ্রষ্টাও ভাবময়, দৃশ্যও ভাবময়। প্রতিভাস-রূপে যাহা দেখা যাচ্ছিল, তাহা ভাবেরই স্ফূর্তি—বুঝা যায়। এই ভাবই বীজ বা ইচ্ছার রূপ। ইহাই কারণ। এ অবস্থায় মন নিষ্ক্রিয়, ইন্দ্রিয় ত' বটেই—শুধু প্রাণ কাজ করছে। এ জগৎটাই ভাবময়, বীজময়, কারণময়।

জীবের এমন কোন ক্ষমতা নাই, যাহাতে কারণজগৎ ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

[= খেয়াল = লীলা (= যোগমায়া ?)]

কারণজগতে যে হাওয়া বইছে, তাহাতেই কারণ তরঙ্গিত হচ্ছে। এ হাওয়া কি ? স্বেচ্ছা, স্বভাব। ফলে ভাবের লহর উঠিয়া লিঙ্গে গিয়ে পড়ছে। লিঙ্গকে চালিত করছে। মন সচল হ'লেই জ্ঞান আবির্ভূত হয়। এই যে নানা-প্রকার চিন্তা মনের মধ্যে ওঠে, অজ্ঞাতসারেও ওঠে, unconscious thoughts প্রভৃতি, ইহাই তাহার কারণ। স্থূলবায়ুর কম্পনে মনে চিন্তা উঠ্‌তে পারে না, যদি কারণ হ'তে তার বীজ না নামে। কারণ হ'তে বীজগুলো এসে মনে

জম্‌ছে—তারপর উদ্দীপনে সেগুলো অঙ্কুরিত হয়ে চিন্তার আকার ধারণ করছে। উদ্দীপন চাই-ই; তবে আমি তা টের নাও পেতে পারি।

সকলের বাইরের আকাশ তমোময়—ইহা ভূতাকাশ। ইহা হ'তেই স্থূল সৃষ্টি হয়, আবার ইহাতেই স্থূল লয় হয়। ইন্দ্রিয়োপহিত দ্রষ্টা যা কিছু দৃশ্য দেখে, তা এই আকাশের কম্পনজন্য আকার। এই আকাশের বিকার। এই আকাশই তমোপহিত সত্ত্ব। আমাদের দৃশ্যমান জগৎ বা বিষয়।

ইন্দ্রিয় গুটাইয়া এক জায়গায় সংহত করিলে যদি বোধ না থাকে, তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, এই আকাশের রূপ তাহাই। ইহাই জড় বা Matter Pure, অর্থাৎ অচেতন মূলসত্তা। যদি সংহত করিলে বোধ ফোটে, জ্যোতি ভাসে তাহা হইলে একটি চেতনপ্রকাশ জাগে। তখন ইন্দ্রিয় ঐ প্রকাশে বিলীন হইয়া যায়। উহাই মন। ইন্দ্রিয়হীন এই মন দ্বারা বাহিরে লক্ষ্য করিলে একটা ছড়ান আলো দেখা যায়। ইহাই অন্তরাকাশ বা দহরাকাশ। ইহারও দুইটি অবস্থা আছে। এক অবস্থায় এই জ্যোতিতে নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন সত্তা (তাহাও প্রতিভাসময়) ভেসে উঠ্‌ছে দেখা যায়। ভেসে উঠ্‌ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন্‌টা কখন কেন ভাসে, তাহা বুঝা যায় না। কখন আবার মিলাইয়া যায়। নিরন্তর এইরূপ হচ্ছে—তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যগুলি সবই জ্ঞানময়।

এই দৃশ্য ও স্থূলাবস্থায় দৃশ্যমান দৃশ্য ঠিক একপ্রকার নহে। ভৌতিক দৃশ্য অন্ধকারের বুকে ভেসে উঠ্‌ছে—অবশ্য তাও আলোকের মধ্যে বটে। ঐ আলোক অন্ধকার ফেটে বাহির হয়, অন্ধকারকে আপন সামর্থ্য অনুসারে দূর করে। তাই স্থূলে আলো ও আঁধার পৃথক্ থাকে,—তাই দিন ও রাত্রি আলাদা। আলোকে দৃশ্য দেখা যায়, অন্ধকারে ঢেকে যায়। প্রাতিভাসিক দৃশ্যও আলোকেই দেখা যায়। তবে সে আলোকের প্রতিযোগীরূপে অন্ধকার দেখা যায় না। তাই সূক্ষ্মে দিনরাত্রি ভেদ নাই। সেখানে সর্বদাই একটা আলো খেল্‌ছে—সে আলোর উদয় অস্ত বুঝা যায় না। একটা ছড়ান আলো সর্বত্র পড়িয়া আছে। সেখানে গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক হ'তে আলো আসে না। বস্তুতঃ এ সকল জ্যোতিষ্ক স্থূলজগতের জিনিস। সূক্ষ্মের ব্যাপী আলো যে কোথা হ'তে আসে, তা প্রথমে জানা যায় না। সে আলো আসে বলিয়াই মনে হয় না। আকাশ আলোময়, প্রতি বস্তুই আলোময়। বাহিরের আলো দ্বারা কিছুই দেখিতে হয় না। প্রত্যেকের ভিতরে আলো আছে। দ্রষ্টাও তাই। সেও তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখ্‌তে হ'লে বাহিরের আলো দরকার হয়।

অন্তর্জগতেও দুই প্রকার অবস্থা—

এক অবস্থায় অন্তরাকাশে—প্রকাশময় অন্তরাকাশে—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় দৃশ্যজাত ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়; আবার ভাসিয়া উঠে, ইত্যাদি নিরন্তর চল্‌ছে। অপর অবস্থায় কোন দৃশ্যই আর ভাসে না,—কেবল ব্যাপক জ্যোতি-স্বরূপ অন্তরাকাশই প্রকাশ পায়।

স্থূলাকাশ যেমন তমঃ, জড়, স্থূলসর্গের কারণ, অন্ধকারময়,—অন্তরাকাশ তেমনই সত্ত্ব, চেতন, সূক্ষ্মসর্গের কারণ, আলোকময়।

ভৌতিক সর্গ বাহ্য বা স্থূলাকাশ হ'তে হয়, তাতে থাকে, তাতেই লীন হয়।

চৈত্তিক সর্গ বা চিন্তারাশি বা প্রাতিভাসিক দৃশ্য অন্তরাকাশ হ'তে হয়, তাতেই প্রকাশ পায় ও তাতেই লীন হয়।

ভৌতিক সর্গ ভূতাকাশের কম্পনে হচ্ছে।

চৈত্তিক সর্গ (=চিত্তবৃত্তি) অন্তরাকাশের কম্পনে হচ্ছে।

দ্রষ্টার ইচ্ছামত ভূতাকাশে তরঙ্গ উঠে না।

দ্রষ্টার ইচ্ছামত অন্তরাকাশেও তরঙ্গ উঠে না।

সুতরাং বুঝিতে হইবে—বাহ্যসৃষ্টি যেমন আমি করছি না, তেমনি আভ্যন্তরীণ সর্গও আমি করছি না। আমি শুধু দেখ্‌ছি মাত্র—অবশ্য রঞ্জিত দৃষ্টিতে। বাহ্যসৃষ্টিও তাই আমার ভোগ্য, আন্তর সৃষ্টিও আমার ভোগ্য। আমি উভয়ের ভোক্তা। শুদ্ধ দ্রষ্টা আমি নহি। তাই আমার কর্তৃত্ব নাই। অবশ্য বিশুদ্ধ ভোক্তৃত্বও আমার তাই নাই।

স্বপ্ন যেমন আমি ইচ্ছামত দেখি না, ধ্যানে রূপাদি যেমন আমার ইচ্ছাধীন ফোটে না, চৈত্তিক সর্গও তেমনি আমার ইচ্ছাধীন নহে। অন্তরাকাশে কত কি উঠ্‌ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে—কিছুই আমার ইচ্ছার অনুসারী নহে। বাহ্য-জগতেও তাই। বাহ্যসৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে—আমার ইচ্ছার ফলে নহে।

এখনও সৃষ্টির রহস্য বুঝা গেল না। কারণজগতে না গেলে সৃষ্টির মূল পাওয়া যাবে না।

বহির্জগতের গোড়ায় যেমন জড় বা অন্ধকার, অন্তর্জগতের গোড়ায় তেমনই চেতন বা আলো। অন্ধকার হইতেই ধীরে ধীরে স্থূল সৃষ্টি ভাসিয়া উঠছে, তেমনই আলো হইতে ক্রমশঃ অন্তর্জগৎ ফুটিয়া উঠ্‌ছে। সাধক তাই অন্তরে ঢুকিলে প্রথমে জ্যোতি দেখিতে পায়, পরে রূপদর্শন হয়।

এবার কারণ-জগতে ঢোকার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমেই দেখিয়াছি—ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করিলেই অন্তর্জগতে প্রবেশ হয় না, জ্যোতির বিকাশ হয় না। কারণ, বিশুদ্ধ জড়ত্ব ও তাহার ফল হ'তে পারে। যদি প্রজ্ঞার বীজ (=শ্রদ্ধা, baptismal grace, শক্তি) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিহিত

করা যায়, জ্ঞান-বীজ যদি ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে বপন করা যায় (C/o. দীক্ষা, দ্বিতীয় জন্ম etc.), তাহা হইলে ইন্দ্রিয় একাগ্র হওয়ামাত্রই প্রজ্ঞাজ্যোতির বিকাশ হইবেই। জড়ত্ব (জড়-সমাধি) আসিবে না।

[C/o. উপায় *versus* ভব]

অতএব অন্তর্জগতের দীক্ষা বা শক্তি-সঞ্চার ভিন্ন অন্তর্জগতে প্রবেশলাভ হয় না। শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইলেই হইতে পারে না। তদ্রূপ যে মনের দ্বারা অন্তর্জগতের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে একাগ্র করিলেই যে কারণ-জগতে প্রবেশ হবে এমন নহে। যদি কারণ-জগতের দীক্ষা বা শক্তিসঞ্চার না হয়, তাহা হইলে শুধু ইন্দ্রিয়হীন মনকে একাগ্র করিয়াই কারণে ঢোকা যায় না। সে রকম করিলে শুধু জ্যোতির দর্শন হইবে। অধিক কিছু নহে।

কিন্তু যদি কারণের দীক্ষা হয় এবং পরে যদি মন (ইন্দ্রিয়শূন্য) একাগ্র হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাব উপলব্ধ হইবে। ইহাই আপন ভাব বা স্বভাব। ইহাই জীবের স্বরূপ। তখন প্রথমতঃ সর্বব্যাপক এক বিশাল ও অনন্ত ভাবময় সত্তাই অনন্দরূপে উপলব্ধ হয়। নিজের ভাব বা অপর ভাবে পার্থক্য থাকে না। পরে আপন আপন ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখন অনন্ত প্রকারের আস্বাদন প্রতি ক্ষণে নব নব ভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। আস্বাদন অনন্ত হইলেও প্রতি ভাবকেন্দ্রের দিক্ হইতেই তাহা ফোটে।

স্থূল জগৎ যেমন প্রত্যেক দ্রষ্টার নিকট পৃথক্ পৃথক্, অন্তর্জগৎ তেমনি প্রত্যেক দ্রষ্টার নিকট পৃথক্ পৃথক্; তদ্রূপ কারণ-জগৎ বা ভাব-জগৎও প্রত্যেক দ্রষ্টার নিকট পৃথক্ পৃথক্।

ভাবাকাশের কম্পনই ইচ্ছা, খেয়াল, বীজাবির্ভাব ইত্যাদি। ভাবদ্রষ্টাও প্রকৃত দ্রষ্টা নহে। নিত্য নূতন ভাবের বিকাশ হইতেছে—সে তাহা সম্ভোগ করিতেছে মাত্র। কিন্তু ভাব যে কেন কিভাবে ফুটিতেছে তাহা সে জানে না। ভাব-জগতের দ্রষ্টা স্বাধীন অথচ অধীন। সে জানে সে স্বেচ্ছায় সব করিতেছে, কিন্তু তাহার স্বেচ্ছা বস্তুতঃ স্বেচ্ছা নহে।

ভাবই বীজ বা কারণ। বীজ-মন্ত্রবলে ভাবের বিকাশ হয়। মন্ত্র দ্বারা ভাবের অতীত হওয়া যায় না। কোন সাধনা দ্বারাই ভাবের অতীত হওয়া যায় না।

আপন ভাবই ইষ্টদেবতা। কারণ-জগৎই ইষ্টদেবতার স্ব-ধাম—উপাস্য-লোক। বীজ ভিন্ন কারণ-জগতে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই।

২২/৫/৩২

কারণ-জগতের কেন্দ্রমধ্যে দুই বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া আছে। ইহাই

মাতা-পিতা। পিতার দিক্ হ'তে ইচ্ছা—মাতার দিক্ হ'তে উপাদান যুগপৎ আবির্ভূত হয়।

২৩/৫/৩২

কারণে চিদংশ ও অচিদংশ—দুই-ই আছে। অচিদংশ বীজ। চিদংশ = ফল বা নির্বীজ ফল। অচিদংশ হ'তে নিরন্তর জীব জন্মাচ্ছে—কর্মভূমিতে পড়ে যাচ্ছে। চিদংশ হ'তে অবতার নামছে। অর্থাৎ অচিতের সত্ত্বাংশ হ'তে তমোংশে পড়ছে। ক্রমশঃ তমো হ'তে উঠ্‌তে উঠ্‌তে, সত্ত্ব বাড়তে বাড়তে সেই অনুপাতে চৈতন্য উপলব্ধি করতে করতে পূর্ণ সত্ত্বাবস্থায় তমো-জয় হয় ও চৈতন্যের স্ফুট প্রকাশ হয়। ইহাই চিদংশ বা কারণ।

আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু কিছু কাজ করছে—তন্মধ্যে কারণ, মূলে চৈতন্য কাজ করছে। ভোগ, ভাল লাগা প্রভৃতি কারণের ব্যাপার।

মহাকারণ সদাই বর্তমান।

কারণ অনাগত।

সূক্ষ্ম অতীত।

স্থূল বর্তমান।

চিদাকাশেই কারণ-জগৎ ভাস্‌ছে। কেবল ঈশ্বর-ঈশ্বরী। কারণবাসী সবই ভাবদেহী।

অন্তরাকাশে সূক্ষ্মজগৎ ভাস্‌ছে। কেন্দ্রে অধিষ্ঠাতা সশক্তিক আছেন।

মহাকাশে স্থূল—কেন্দ্রেও তদ্বৎ।

২৩/৫/৩২

তাহা হইলে জন্ম তিনটি হইলঃ—

১। প্রথমটি তমোগর্ভে বা অ-জ্ঞানে জন্ম। ইহাই স্থূলজন্ম। এই তমঃ হ'তে যে দেহ লাভ হয়, তাহা স্থূলদেহ। দ্বিতীয়জন্ম না হ'লে এই মণ্ডল পার হওয়া যায় না। কারণ, মৃত্যুতে আবার ঐ তমোগর্ভেই ডোবে। পুনর্বার ঐ তমঃ হ'তে জন্ম হয়। প্রথম মণ্ডলে ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাওয়া যায় না। ইহাই কর্মভূমি।

২। দ্বিতীয় জন্ম জ্ঞানে। ইহা সূক্ষ্মজন্ম। জ্ঞান হ'তে যে দেহ লাভ হয়, তাহা সূক্ষ্মদেহ বা জ্ঞানদেহ।

৩। তৃতীয় জন্ম ভাবে। ইহা কারণ-জন্ম। ভাব হ'তে যে দেহ হয়, তাহা কারণ-দেহ। ভাবদেহ।

অ-জ্ঞান বা জড়ত্ব হ'তে ইন্দ্রিয়ের বিকাশই স্থূলদেহলাভ। ইন্দ্রিয় লুপ্ত হলে আবার অ-জ্ঞানে লয় হয়। আবার অজ্ঞান হ'তে ইন্দ্রিয় ফোটে। অ-জ্ঞান

বা জড়ত্ব = নিদ্রা; ইহা মৃত্যু হইতে জন্ম পর্যন্ত স্থায়ী। ইহার মধ্যে যে স্বপ্ন ফোটে তাহাই স্বর্গ-নরকাদি পারলৌকিক অনুভূতি। যাহারা মৃত্যুকালে ঘোর সুষুপ্তিতে ডোবে, তাহারা স্বর্গে যায় না, নরকে যায় না। মূর্চ্ছিতবৎ থাকে —পরে জন্মগ্রহণ করে। মূর্চ্ছাকালে ইন্দ্রিয়গুলি জমে থাকে। একটু শিথিল হ'লেই স্বপ্নবৎ অনুভব হ'তে আরম্ভ হয়।

অতএব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হ'লেই সব হ'ল না। গুরু যদি জ্ঞান-বীজ দিয়ে থাকেন, তা হ'লে স্থূলজগৎ পার হওয়া যায়। নতুবা নহে। সত্যজ্ঞান ক্ষেত্রে পতিত হইলে ইন্দ্রিয় একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইবামাত্রই, একদিকে যেমন নিজে জ্ঞানদেহী রূপে আবির্ভূত হয়, অপরদিকে তেমনই বিরাট্‌জ্ঞানের আলোকে সূক্ষ্ম ও প্রতিভাসময় জগৎ প্রকাশিত হয়। জন্মমৃত্যু সব স্থূলের খেলা। জ্ঞান-জগতে প্রবিষ্ট হ'লে জন্মমৃত্যু কাটিয়া যায়। জ্ঞানদেহী কে? আত্মা ইন্দ্রিয়হীন মনে অধিষ্ঠিত হ'লে ও তাহাতে অভিমান করিলে জ্ঞান-দেহী বলিয়া বর্ণিত হয়।

সাধারণ লোকে মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকাদি ভোগ যে দেহে করে, আর জ্ঞানী স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্ম-জগতের অনুভব সে দেহে করে, উভয় এক প্রকার দেহ নহে। দুই-ই লিঙ্গদেহ বটে,—কিন্তু প্রথম দেহে জ্ঞানের আলোক পড়ে নাই বলিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হয়, স্বপ্নবৎ। দ্বিতীয় দেহ জ্ঞানময় ও ইন্দ্রিয়-বিরহিত শুদ্ধ মনোময়। প্রথম দেহে যে জগতের (স্বর্গ-নরকাদির) অনুভব হয়, তাহা স্বাপ্নিক, subjective. দ্বিতীয় দেহে যে জগতের দর্শন হয়, তাহা সত্য (যদিও সূক্ষ্ম) ও objective. স্বর্গ-নরকাদি স্বাপ্নিক হ'লেও সাধারণ স্বপ্নের ন্যায় নহে। কারণ, যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয় ও যে মহানিদ্রায় স্বর্গাদি দর্শন হয় উভয় এক প্রকার নহে।

সত্য বা objective স্বর্গাদিও আছে। সেগুলি সব স্থূলজগতের অন্তর্গত। সেখানে যাইয়া তদুপযোগী স্থূলদেহ গ্রহণ করতে হয়।

২৫/৫/৩২

কারণ হ'তে জ্যোতি বাহির হইতেছে। জ্যোতি দ্বারাই কারণটি ঘেরা আছে। জ্যোতির বাহিরেই নাদ। জ্যোতি ও নাদ দুইটিই সূক্ষ্মস্তরের অন্তর্গত। মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কতকটা বন্ধ করিয়া ভিতরের শব্দ শোনে, তখন সে সূক্ষ্মজগতে যাওয়ার পথ খুঁজিতেছে। ইন্দ্রিয়ের কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া গেলেও যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে যে শব্দ শোনা যায়, তাহা চেতন শব্দ। ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ-জ্ঞান আসিলে জড়ত্ব।

এই শব্দের মধ্যে একটা আনন্দ আছে। শব্দের পশ্চাতে যে আলো আছে, শব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলে সেই আলো পাওয়া যায়। আলো ভেদ করিতে করিতে রূপের বিকাশ হয়।

সাধারণতঃ শব্দ পর্যন্তই মন। আলোর বিকাশ হ'লে মন তাতে লীন হইয়া যায়; শব্দ শুনিতে শুনিতে মন একাগ্র হইয়া আসে—ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে থাকে। পরে নিরুদ্ধ হইলেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়। তখন মন স্বয়ং জ্যোতির্ময় হয় বলিয়া ব্যাপক জ্যোতির সঙ্গে মিলিয়া যায়। তবে ইহা এক সময়েই হয় না। কাল-বিলম্ব হয়। মনও জ্যোতি, ব্যাপক জ্যোতিও জ্যোতি—উভয়ে বেশ পার্থক্য বুঝা যায়। জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি ভাসছে, ডুবছে, চল্‌ছে দেখা যায়। ক্রমে দুই জ্যোতি সমান হইয়া গেলে মনকে আর ধরা যায় না।

অনেকে ইহাকেই মুক্তি মনে করে।

শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে মন সূক্ষ্ম হ'তে থাকে—অর্থাৎ মনের ময়লা কাটিয়া যায়। সূক্ষ্মতম মন=মনের পরমাণু। এই অবস্থায় যে শব্দ শোনা যায় তাহা শব্দের চরমাবস্থা, যার পর শব্দ নাই। মনের নিরোধ ও শব্দাতীত জ্যোতির বিকাশ সমকালীন। তবে জ্যোতির পূর্ণতা হ'তেও সময় লাগে, মনের নিবৃত্তিতেও সময় লাগে। জ্যোতি পূর্ণ হ'লে মন থাকে না। শুদ্ধ-জ্যোতিই থাকে। তবে তাহার ব্যক্ত রূপ থাকে না বলিয়া তাহাকে জ্যোতি না বলাই ভাল। মন যেমন যেমন সূক্ষ্ম হয়, শব্দও তেমন তেমন সূক্ষ্ম হয়।

শব্দ মূলাধার হ'তে উঠ্‌ছে ও ক্রমশঃ চেতন হ'তে হ'তে সহস্রারে গিয়ে লীন হচ্ছে। শব্দ যতই উপরে উঠে ততই সূক্ষ্ম ও চেতন হয়। মন শব্দকে শুন্‌তে থাক্‌লে এবং ছেড়ে না দিলে ক্রমশঃ মনও সূক্ষ্ম হয় ও চেতন হয়। পরে মন ও শব্দ এক সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়—তাহাই চৈতন্যাবস্থা।

শব্দই সৃষ্টির বীজ, চৈতন্যই তাহার ফল। উভয়ই কারণাবস্থা। অর্থাৎ কারণ-জগতের অচিদংশ হ'তে নিরন্তর নাদ ফুটিতেছে ও স্বভাবের স্রোতে চিদংশে যাইয়া লীন হইতেছে।

শব্দ ত' চিদাকাশ হ'তে উঠ্‌ছে, অন্তরাকাশ হ'তে উঠ্‌ছে ও ভূতাকাশ হ'তেও উঠ্‌ছে।

চিদাকাশ হ'তে যে শব্দ উঠ্‌ছে তাহাই চৈতন্যধারা বা জ্যোতি বা পশ্যন্তী (?)। অন্তরাকাশ হ'তে যে শব্দ উঠ্‌ছে তাহাই মধ্যমা শব্দ। ভূতা-কাশের শব্দ বৈখরী।

বাহ্যজগতেও একটিমাত্র আধার হইতে সকল শব্দের উদ্ভব হয়। পরে বায়ুর বিভিন্নতাবশতঃ তাহা নানা প্রকার হইয়া যায়। বাহ্যাকাশকে কম্পিত করে কে? অন্তরাকাশের কম্পন। অর্থাৎ সঙ্কল্প বা মধ্যমা-বাক্‌। এই

অন্তরাকাশ কম্পিত হয় কেন? ভাবাকাশের তরঙ্গে। ভাবের তরঙ্গ হইতে সঙ্কল্প জন্মে, সঙ্কল্প হ'তে ভূতাকাশ কম্পিত হয়।

৭/৬/৩২

কারণ হ'তে যে প্রভা চারিদিকে বাহিরে ছড়াইয়া আছে, তাহাই ব্যাপক লিঙ্গ-জ্যোতি। ইহা সাধারণ। যতদিন সৃষ্টি আছে, ততদিন ইহাও আছে। প্রলয়ে এই জ্যোতি উপসংহৃত হইয়া থাকে। হইয়া কারণে লীন হয়। বিশিষ্ট সৃষ্টি এই জ্যোতির বৈষম্য হ'তে বা তরঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হয়। এই জ্যোতিতে সৃষ্টির সকল প্রকার লিঙ্গই বর্তমান আছে।

কারণে ইচ্ছা বা প্রয়োজন উঠিলেই কারণের শান্তপ্রায় বক্ষে একটু তরঙ্গ খেলে। সঙ্গে সঙ্গে কারণের ঐ অংশ লিঙ্গ হইয়া নামিয়া পড়ে। নামিয়া ব্যাপক জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঘোরা-ফেরা করে। পরে সুবিধা বা ক্ষেত্র পাইলেই স্থূলে নামিয়া পড়ে।

প্রকারান্তরে স্থূল হ'তে পৃথক্ হইবামাত্রই ঐ ব্যাপক-জ্যোতিতে প্রবেশ হয়। ঐ ব্যাপক-জ্যোতিই ত' অন্তরাকাশ।

৭/৬/৩২ to ৮/৬/৩২

কোন একটি জিনিসের ভিতরটি যদি শূন্য হয় ও সেই শূন্য যদি বায়ু-পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা জলে ডুবাইয়া দিলেও ভাসিয়া উঠিবে। ছিদ্র থাকিলে ছিদ্র দিয়া বায়ু চলিয়া যাইবে ও জল ভরিবে।

তদ্বৎ এই শরীরমধ্যে যদি কোন স্থান বায়ুহীন করা যায় ও যদি সেখানে আকাশ বা energy ভরা যায় তাহা হইলে শরীর ভূমি হইতে শূন্যে উঠিবে। ভূতল হইতে উপরদিকে অবিচ্ছিন্ন বায়ু আছে। তবে ভূতলে বায়ুর সম্বন্ধ ভূ'র সহিত অধিক, তদ্বৎ অপর প্রান্তে আকাশের সঙ্গে অধিক।

দেহাভ্যন্তরে কোন স্থান আপেক্ষিকভাবে বায়ু-শূন্য ও আকাশপূর্ণ করিলেই দেহ উপরে উঠিবে। বায়ুর হীনতা ও আকাশের আধিক্য অনুসারে গতির ঊর্ধ্বতা হইবে।

বেশী পরিমাণ আকাশ ভরিলে শরীর ক্রমশঃ পার্থিব ভাব হারাইবে।

৯/৬/৩২

স্থূল হ'তে লিঙ্গকে আলাদা করিলে স্থূল থাকে না—কারণ, লিঙ্গই পরমাণুগুলিকে একটি বিশেষ আকারে ধরিয়া রাখে। পরমাণুগুলি পৃথক্

হ'য়ে যায় বটে—কিন্তু ঐ আকারের একটা সংস্কার (পাকজ সংস্কার) তাতে থাকে।

তেমনই লিঙ্গও পৃথক্ হওয়ামাত্রই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিতে চায়।

লিঙ্গকেও স্থূল হ'তে পৃথক্‌ভাবে ধরিয়া রাখা কঠিন। তবে গণ্ডী দিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল বিরাট্ লিঙ্গে থাকিয়াও তাতে বিলীন হয় না। গণ্ডী দিতে হয়,—সত্ত্ব দ্বারা। ঐ লিঙ্গকে পুনরায় স্থূলভূমিতে নামাইলেই পূর্ববৎ স্থূলবস্তু নির্মিত হয়। কারণ, তখন পূর্বকালীন পরমাণুগুলি আসিয়া লিঙ্গকে ঘিরিয়া ধরে ঠিক পূর্বাকারে।

তবে লিঙ্গ স্থূলাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। কোন স্থূল যখন থাকে না, তখনও বহু লিঙ্গ থাকে। লিঙ্গ অপেক্ষা কারণ দীর্ঘস্থায়ী। লিঙ্গ না থাকিলেও কারণ থাকে।

স্থূল-লয় = প্রথম প্রলয়।

লিঙ্গ-লয় = দ্বিতীয় প্রলয়।

কারণ-লয় = তৃতীয় প্রলয় বা মহাপ্রলয়।

তদ্বৎ, স্থূল হ'তে পৃথক্ হওয়া = প্রথম মুক্তি।

লিঙ্গ হ'তে পৃথক্ হওয়া = দ্বিতীয় মুক্তি।

কারণ হ'তে পৃথক্ হওয়া = তৃতীয় মুক্তি।

প্রত্যেকটি ভাবের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয় না। ভাব কারণস্থ। ভাব হ'তেই আনন্দ। ভাবের তরঙ্গই লীলা।

ভাব ও গুণ। শুদ্ধসত্ত্ব = গুণ, তার তরঙ্গই বা আকারই ভাব।

প্রত্যেকটি জীব এক একটি ভাবের বিকাশ।

১৪/৬/৩২

আমি একটি ঘট দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে যদি তন্ময় হই, তা হ'লে দু'টি অবস্থা হ'তে পারে।—

১। যদি বোধ হারাইয়া ফেলি তা হ'লে আমি ঘট হ'য়ে গেলাম—আমার চিত্ত ঘটাকার হ'ল। কিন্তু আমি তা' দেখ্‌তে পাব না; কারণ, আমি অচেতন।

২। যদি বোধ থাকে তা হ'লে আমার চিত্ত ঘট হ'য়ে যায়, আর আমি তার দ্রষ্টা হ'য়ে দেখি। কারণ, আমি চেতন। এই অবস্থায় আমি ঘট হইয়াও ঘট হ'তে পৃথক্। তবে এই যে ঘট হওয়া বা ঘটাকার চিত্তকে দেখা, উভয়ই ঠিক ঠিক নহে। ইহা সমাধি। যা হোক্, এই অবস্থায়ও চিত্ত দেহত্যাগ করে না। এই ঘটাকার দৃশ্য চিত্ত = লিঙ্গ এবং দ্রষ্টা—চিত্ত = কারণ। এই দুইয়ের মিলনে আনন্দের বিকাশ হয়। তার ফল দ্বৈত-লোপ।

চিত্তকে যে কোন ইষ্ট আকারে পাওয়া যায়। আমি তার দ্রষ্টা ও ভোক্তা থাকি। পরে তার সঙ্গে মিলন হয়—তখন আনন্দ।

(মূলেও তাইঃ সৎ = দৃশ্য } মিলনে আনন্দ)
চিৎ = দ্রষ্টা }

ঘটাকার চিত্তকে দেখা। তদ্রূপ বিশ্বরূপ চিত্তকে দেখা যায়। দ্রষ্টা কারণ। কারণ যাহা দেখে সবই জ্ঞানময়। তার দৃশ্যজগৎ সাকার জ্ঞানসমূহ।

কিন্তু এই আকার আরোপিত, কি স্বাভাবিক? আরোপিত হ'লে, আরোপ সরিলেই এক বিশাল নিরাকার জ্ঞান আবির্ভূত হইবেই।

স্বাভাবিক হ'লেও আকারের অন্তরালে নিরাকার আছে। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক। সুতরাং ঐ বিশাল জ্ঞানই আনন্দ

১৫/৬/৩২

দুই প্রকার কর্মেরই ফল গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম প্রকার ত' স্পষ্টই। মূলে স্ব-ইচ্ছা না থাকিলেই যে কর্ম হয় না, তাহা নহে। না জানিয়া, না স্থির করিয়া আগুনে হাত দিলেও হাত দগ্ধ হয়। বস্তুশক্তি কার্য করে। ইহারও মূল অ-জ্ঞান। জ্ঞানে আসিলে, সর্বত্র ঈশ্বরেচ্ছা প্রত্যক্ষ হইলে, বস্তুশক্তি কার্য করে না, কর্ম কাটিয়া যায়। প্রথম বা দ্বিতীয় কোন প্রকার কর্মই হয় না। জ্ঞান ও ঈশ্বরেচ্ছা দর্শন না হইলে law-এর অধীন থাকিতেই হইবে। বদ্ধাবস্থা হইলে law থাকে না। যে মুক্ত তার উপর Law of nature কাজ করে না। শুধু জ্ঞানী হ'লে সে law-র উপরে। ভক্ত হ'লে সে ভগবদিচ্ছার অধীন —law-র নহে। Law nil. যোগী হ''লে তার ইচ্ছা = ভগবদিচ্ছা। এ স্থলে তার ইচ্ছাই law of nature, অন্যের নিকট।

যতক্ষণ অ-জ্ঞান আছে, ততক্ষণ জগতের সকল শক্তিই যথাবৎ আমার উপর act করিবেই। সুতরাং ততক্ষণ আমি কর্ম ও ফল ছাড়াইতে পারি না। অ-জ্ঞানের আবরণ-মধ্যে যে ব্যাপক ইচ্ছার বিকাশ হয়, তাহারই একদেশ স্বেচ্ছা, পরদেশ পরেচ্ছা; তদ্ভিন্ন দেশ অনিচ্ছা বা প্রাকৃতিক নিয়মরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং যেটা অনিচ্ছা বা জড়নিয়ম, তাহাও অ-জ্ঞানমূলক। সৃষ্টি-প্রবর্তন ব্যাপক ইচ্ছার অন্তর্গত। অতএব অনিচ্ছাকৃত কর্মও বস্তুতঃ ইচ্ছাকৃত। তবে সে ইচ্ছা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের গোচর নহে বলিয়া সেটাকে আমার ইচ্ছা বলিয়া বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক পক্ষে সেটাও আমারই ইচ্ছা—নতুবা ফল আমাকে ভুগিতে হইত না, নতুবা law of nature-এ আমি respond করিতাম না। সমগ্র ব্যাপক ইচ্ছাটি যদি আমার জ্ঞানের গোচর হয়,

তা হ'লে সেটা আমার ইচ্ছা ব'লে বুঝা যায়। তখন সমস্ত কর্মই আমার হ'য়ে যায়, তাই সকল ফলই আমাকে নিতে হয়।

২৯/১১/৩২

মূলবস্তু পুরুষ ও প্রকৃতি একাকার—শিব ও শক্তি একাকার। তাতে স্বাতন্ত্র্য আছে।—ইহাই স্পন্দ—ইহা অনাদি।

ইহার স্ফুরণ হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথম স্ফুরণ হইতে মূলবস্তুতে যেন একটা বিভাগ হয়। ফলে অব্যক্ত হ'তে একাংশ ব্যক্ত হয়। অব্যক্ত হয় প্রকৃতি, পুরুষ তদতীত ও নিরঞ্জন থাকে। ব্যক্তই আদি সৃষ্টি—পরবর্তী সৃষ্টি ব্যক্ত হইতেই হয়।

এই প্রথম স্ফুরণই ইচ্ছা। মূলবস্তু সত্যস্বরূপ—তাহা চৈতন্য, তাহা আনন্দ—কিন্তু একাকার, তাহার প্রকাশ নাই। তাই এসব নামও সেখানে চলে না। ইচ্ছার আবির্ভাবে এই অখণ্ড সত্তাতে বিভাগ হয়—এক ভাগ হয় চৈতন্য, অপর ভাগ হয় আনন্দ। এক ভাগ হয় পুরুষ, অপর ভাগ প্রকৃতি। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা।

আনন্দ চৈতন্য হ'তে পৃথক্ হ'লেই—ভোগ্য হ'লেই—তাহা অনন্ত কলা-বিশিষ্ট হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং চৈতন্য—যাহা কলাতীত—তাহা তদতীত হইয়া যায়। তাহাই চিৎকলা। স্ফুরণের পূর্বাবস্থা। চিৎকলা শব্দের প্রয়োগ হয় না।

ব্যক্ত প্রকৃতি বা মহৎ অব্যক্ত প্রকৃতির একাংশ,—এক ক্ষুদ্র অংশ। ইহাতে অনন্ত কলার ১৬ কলা আছে। তন্মধ্যে প্রকৃতির ১৫ কলা ও পুরুষ বা চিৎকলা এক ষোড়শী কলা।

মহান্ আত্মাই বিন্দু। ইহা বৃত্তাকারে কল্পিত হইতে পারে। কেন্দ্রটি পুরুষ বা চিৎকলা—চারিদিকে পঞ্চদশ কলা। এখানে অহং ভাবের পূর্ণ বিকাশ। এখানে বোধ, আনন্দ সব পূর্ণভাবে প্রকাশমান—অবশ্য আধারানুসারেই পূর্ণত্ব।

অব্যক্ত হ'তে মহতের বা আত্মার প্রকাশ রহস্যময়। প্রথমে ১ কলার অভিব্যক্তি—এই ১ কলা অব্যক্তের অভিব্যক্ত রূপ। চিৎকলা ত' আছেই। ইহাই তারাখ্যা মহাবিদ্যা—ইহাই পরমেশ্বরের অনুরূপ। এই ১ কলাকেই প্রতিপদ তিথি বলে। ইহাই পশ্যন্তী বাক্—অমৃতকলা। অব্যক্ত = অমাবস্যা। তাহাই কালী। ১৫ কলা পূর্ণ হ'লে (ষোড়শী চিৎকলা ত' আছে) তাহাই পূর্ণকলা, ললিতা, ত্রিপুরা, ষোড়শী, রাজরাজেশ্বরী। সমগ্র শুক্লপক্ষই তারা হ'তে ষোড়শী পর্যন্ত বিকাশের পথ। রাজরাজেশ্বরী পরমেশ্বরের মহৎ রূপ।

কলাগুলি বিন্দু না হওয়া পর্যন্ত তাতে অহং ভাব জাগে না। তাই বোধ, ভাব, আনন্দ, কিছুই চেত্যমান হয় না। ১৫ কলার মধ্যে যাবতীয় শক্তি আছে। অব্যক্তের কথা ত্যাজ্য।

এই অহম্ পূর্ণ অহম্। ইহাই আত্মা। শুক্লপক্ষ নিত্য চল্‌ছে—তাই নিত্যই অহম্ আপূরিত হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ অহং-রূপে বিন্দু হ'তে কলার ক্ষয় হ'তে থাকে—ইহাই নৈরাত্ম্য বা শূন্যের দিকে গতি। অমাবস্যাই শূন্য—নির্বাণ। যোগাচারের এই পূর্ণিমাই লক্ষ্য—মাধ্যমিকের লক্ষ্য অমাবস্যা। বাহির হ'তে কলার উপসংহার করিয়া একাগ্র করাই যোগাচারে প্রবেশ।

বিন্দু = আধার। কলাগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া এক না হইলে তাতে আধেয় (ধর্ম = জ্ঞান, আনন্দ etc.) থাক্‌তে পারে না। অব্যক্ত হ'তে যা বাহির হয়, তা' এক—অথচ স্বগত-ভেদ আছে, ১৫ কলা আছে। এই এক ভাবটা প্রকাশ পায় ১৫ কলার আবির্ভাব হইলে। ১৫ = অন্ত্যকলা। তাহার ব্যক্ততার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু গঠিত হয়। পরিধি আবর্তিত হ'তে হ'তে পূর্ণ হ'লেই কেন্দ্র প্রকাশ পায়—তাহাই এক। তাহাই বিন্দু। তাহাই আত্মা। পরিধি = আত্মশক্তি। পরিধির প্রতি বিন্দুই এক একটি radius-এর প্রান্ত। সমগ্র পরিধি আর সমগ্র radiation একই কথা। তা হ'লেই কেন্দ্র প্রকট হয়—আত্মার আবির্ভাব হয়।

আত্মার আবির্ভাব কি প্রকারে হয়?

আবর্তনটি বুঝ। প্রত্যেকটি কণা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে—rotation. একবার ঘুরা হইলেই বাহ্যপথে একটু এগিয়ে যায়। যেমন minute hand-এর চলার সঙ্গে সঙ্গে hour hand ধীরে ধীরে চলিতেছে, তদ্রূপ কণা যতই নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ততই অপরের চারিদিকে ঘোরা হইতেছে। নিত্যকর্ম হইতে এইজন্যই উন্নতি আপনা আপনিই হয়। নিজের কাজ করিলেই পরের কাজ হইয়া যায়। যে সময়ে একবার কণা জন্মস্থানে ফিরিয়া আসে, তখনই তার মৃত্যু হয়—তাহা রূপান্তরে অধিকতর সারবান্ হইয়া আবার তদ্বৎ ঘুরিতে থাকে। এবারকার circumference আরও ছোট। প্রথম বৃত্তের কেন্দ্র প্রকট হয় আবর্তন সমাপ্ত হইলেই। এই প্রকারে radius প্রত্যেক আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোট হইয়া আসিতে থাকে। Radius-এর মান ক্রমশঃ ১-এ পর্যবসিত হয়। শূন্য হয় না। তখন radius, circumference ও কেন্দ্র —তিন একাত্মক হয়। এক এক কলার এক এক আবর্তন স্বীকার করিলে ১৫ কলার জন্য ১৫ বার আবর্তন মানিতে হয়। ১৫ পূর্ণ হইলেই এক ভাব উপলব্ধ হয়—সেখানে circumference বা ব্যক্ত কলা, radius বা স্পন্দ ও centre বা কূটস্থ চিৎকলা একাকার হইয়া আত্মরূপে স্ফুরিত হয়, বিন্দু হয়।

যে জগতে আমরা আছি তাহার উপাদান ১৫ কলা বলিয়া ১৫ কলার আবর্তন পূর্ণ না হ'লে বিন্দু পূর্ণ হয় না। যদি ৫ কলার জগৎ হইত, তাহা হইলে পঞ্চম কলার আবর্তন পূর্ণ হ'লেই পূর্ণবিন্দু বা অহম্ পাইতাম।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে এইরূপ একটি অহম্ আছে—ইহাই আত্মা বা কারণ। ইহার উপরে আর অহম্ নাই—এই অহম্ ভাঙ্গিবার প্রণালীই কৃষ্ণ-পক্ষ।

প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, প্রভৃতি স্ফুরন্ত শক্তিমাত্র। সব আল্‌গা আল্‌গা। বিন্দু না হ'লে সমষ্টি হয় না।

২/১২/৩২

কামবিজ্ঞান কি?

কাম মানে ইচ্ছা বা অভাব-বোধ। এ অভাব-বোধ তিন প্রকারে হয়ঃ—

১। অভাব আছে, তার বোধও আছে।

২। অভাব নাই, অথচ অভাব-বোধ আছে।

৩। অভাব আছে, অথচ বোধ নাই।

ইহার মধ্যে প্রথমটি normal.

দ্বিতীয়টির তাৎপর্য এইঃ স্থূলে অভাব নাই, লিঙ্গে অভাব আছে। তাই ঐ অভাব-বিষয়ে বোধ জাগে। কিন্তু লিঙ্গ ও স্থূলের তাদাত্ম্যাধ্যাস বশতঃ স্থূলবিষয়ক বলিয়াই উহা মনে হয়। এই অবস্থায় স্থূল বিষয়ের আপূরণের দ্বারা ঐ অভাব দূর হ'তে পারে না। Hypnotise করিয়া বা অন্য প্রকারে লিঙ্গে সাক্ষাদ্ভাবে ভাব-সঞ্চার দ্বারা ঐ অভাবের নিরাকরণ হইতে পারে। অনেক সময় রোগকালে পিপাসা বোধ হয়—অথচ জলপান করিলেও তাহার উপশম হয় না। সাময়িকও নহে। কারণ, ঐ জলাভাব স্থূলপরমাণুর নহে। এই প্রকারে স্থূলে মিলন হইলেও বিরহ নিবৃত্ত হয় না—সে স্থলে বুঝিতে হইবে বিরহ স্থূল নহে, ভিতরে। সুতরাং অন্তরে মিলন আবশ্যক। "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"।

তৃতীয়টির তাৎপর্য এইঃ লিঙ্গ যদি স্থূল হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হয় তা হ'লে স্থূলের অভাব থাকা সত্ত্বেও তাহার অনুভব হইতে পারে না—কিঞ্চিৎ আভাস থাকেই। তাই অতি সূক্ষ্মভাবে অভাব-বোধও থাকে। কিন্তু স্থূলাভিমানীর তাহা বোধে আসিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে বোধ আছে—তবে অতি মন্দ।

আসল কথা, স্বাভাবিক নিয়ম ইহাই—অভাব থাকিলেই তাহার বোধ থাকিবেই।

সৃষ্টির মূল রহস্যই ইচ্ছা—কাম। যে অদ্বয়তত্ত্ব স্পন্দস্বরূপ স্বাতন্ত্র্যের

উন্মেষে—ক্রিয়াবশতঃ, ইচ্ছাবশতঃ দুই ভাগ হয়—তাহার একাংশ চৈতন্য, অপরাংশ আনন্দ। প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ যথাক্রমে

(ক) আদিতে	দ্রষ্টা ও	দৃশ্য
	=চিৎ	=সৎ
	অর্থাৎ ১ মাত্রা চিৎ।	অর্থাৎ ১ মাত্রা আনন্দ।
	(ইহাতে চেতনভাবের স্ফুরণ নাই। চিন্মাত্র)	(ইহাতে আনন্দভাবের স্ফুরণ নাই। আনন্দমাত্র)
(খ) পরে	ভোক্তা ও	ভোগ্য
	=চেতন	=আনন্দময়।

সুতরাং চেতন-পুরুষ হইতে আনন্দরূপা প্রকৃতি পৃথক্ হওয়ার দরুণ উভয়ে উভয়কে চায়। নতুবা পূর্ণতা হ'তে পারে না,—আনন্দ হ'তে পারে না। তবে পৃথক্ হ'লেও উভয়ে উভয়ের আভাস থাকেই। পুরুষে প্রকৃতির আভাস না থাকিলে প্রকৃতিকে চাহিতে পারে না। তদ্বৎ প্রকৃতিতে পুরুষের আভাস না থাকিলে সে পুরুষের সঙ্গে মিলিতে পারে না।

অতএব সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই এই অভাব-বোধ রহিয়াছে। তাহারই ফলে আকর্ষণ হয়। মনে কর ইন্দ্রিয়। চক্ষুতে অভাব আছে, তাহার বোধও আছে। এই বোধ যেমন যেমন জাগিতে থাকে, তেমন তেমন সে ভাবকে চায়। এই অভাব-বোধই রূপতৃষ্ণা—রূপই ভাব; রূপ যতই তাহাতে মিলিত হয়, ততই তাহার তৃপ্তি হয়, পূর্ণতা হইতে থাকে। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েই কাম রহিয়াছে—নতুবা তাহা বিষয়ের দিকে ভোগের জন্য ধাবিত হইত না। মনও তদ্বৎ অপূর্ণ ও অশুদ্ধ। যাহা লইয়া আমার আমি, সবই অপূর্ণ, অতৃপ্ত—সেইজন্য দুঃখী। তাই আমি ভোক্তা হইয়া পড়িয়াছে। যখন সেগুলি ভাবকে প্রাপ্ত হইবে, তখন পূর্ণ হইবে—তৃপ্ত হইবে—আনন্দ পাইবে; তখন তাহার অভাব-বোধ নিবৃত্ত হইবে। তখন আর সে ভোক্তা থাকিবে না। বিষয়ও আর ভোগ্য থাকিবে না। ভোক্তা শুদ্ধ হইয়া দ্রষ্টা হইবে, ভোগ্য শুদ্ধ হইয়া দৃশ্য হইবে। আভাস-বশতঃ এই দ্রষ্টাও ভোক্তা বটে, দৃশ্যও ভোগ্য বটে, তবে তাহা শুদ্ধ। যেমন দেবতাদের।

কি প্রকারে এই কাম তৃপ্ত হইবে? ইহার কিছু আলোচনা "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি" ধর্মের প্রসঙ্গে হইয়াছে। আরও বলি।

○	○
ভোক্তা	ভোগ্য
অপূর্ণ	অপূর্ণ

এগুলি কণরূপে বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া আছে। এগুলি

ভোক্তার সত্ত্বাংশ। ভোগের সময় এগুলি ভোক্তার আধারে ফিরিয়া যায়। ঐ আধারে ইহাদের অভাবটা (=বাসনা) রহিয়াছে। এগুলি ফিরিয়া গেলেই ঐ অভাব দূর হয় ও তৃপ্তি হয়। তবে কালপ্রভাবে স্তরে স্তরে যেমন অভাব ফুটিতে থাকে, তেমনি তেমনি ভাব যাইয়া তাদের নিবৃত্তি করে।

শুদ্ধ অবস্থায় ভোক্তা আপ্তকাম, সে আনন্দী—তার অভাব নাই, বোধও নাই। আনন্দের আস্বাদন আছে। অভাবের আভাস আছে মাত্র,—নতুবা আনন্দের আস্বাদন থাক্‌ত না। অশুদ্ধাবস্থায় ভোক্তার আধার বা উপাধি বা নির্মল সত্ত্ব ভগ্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ হয়—অভাব বা বাসনারূপে একাংশ ভোক্তাতে থাকে, ভাব বা ভূতরূপে অপরাংশ বাহিরে থাকে। বাসনা বা অভাব চিত্তের ধর্ম। ভাব ভূতের ধর্ম।

আরও একটি কথা আছে। উপাধিতে যাহা আছে, তাহা অভাব বা বাসনা —সত্ত্বকণা বাহির হইয়া যাওয়ার দরুণ একটা ফাঁক, যাহা বোধের বিষয়ীভূত। ইহাই অস্পষ্ট অভাব-বোধ বা দুঃখ। কিন্তু ফাঁক শুধুই ফাঁক নহে। সত্ত্বকণা ভৌতিক জগতে যে ভাবে ডুবিয়াছে সেই ভাবটা, ভূতাংশ, ঐ ফাঁকে আসিয়া সঞ্চিত হয়। অশুদ্ধ ভোক্তার উপাধি এই সকল ভূতকণাকে ভরা। ইহাই বাসনা—তৃষ্ণা—কাম—ইচ্ছা।

এখন কথা এইঃ—উপাধি শোধনের ক্রম এই—

(ক) উপাধি হ'তে ভূতকণাগুলিকে সরান চাই।

(খ) উপাধিতে আপন সত্ত্বকণাগুলি ফেরান চাই।

ভূতকণা যখন অব্যক্তভাবে থাকে, তখন তাহাদের সরান সম্ভবপর নহে। বৃত্তিরূপে উঠিলে অবশ্য সেটা বিচার্য্য। বৃত্তিরূপে উঠিলে সেটা ভুক্ত হইয়া যায়—অর্থাৎ সত্ত্বকণা আসিয়া জোটে। কারণ, সত্ত্বকণা বা সোমাংশ বাহির হইতে না আসিলে ভোগ হয় না। সুতরাং সত্ত্বকণার সহযোগ ব্যতিরেকে উপাধি হ'তে ভূতকণা সরান যেতে পারে না। যেমন আলো ভিন্ন অন্ধকার সরান যায় না।

এটা অশুদ্ধ ভোগের পথ। ভোগের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয় বটে, ভূতকণা সরে বটে—কিন্তু ইহাতে দোষ আছে। যথা—

উপাধিতে কত যে ভূতকণা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনিয়ত সুদীর্ঘ-কালে তাহার অপসারণ সম্ভবপর, ভোগদ্বারা। অবশ্য যদি নূতন ভূতকণা আসিয়া না জোটে, তবেই। কিন্তু নূতন নূতন ভূতকণা আসিবেই। কারণ, যে আকর্ষণে ভূত আসে, তাহা রহিয়াছে—আসক্তি—সুতরাং আবার ভূত আসিবেই। সত্ত্বকণাও বাহির হইবেই। নূতন ভূতকণা আসা বা সঞ্চিত সত্ত্বকণা যাওয়া বন্ধ হইয়া গেলে ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় অবশ্য হইবে।

কিন্তু জ্ঞানের পথ পৃথক্। উপাধিকে যদি ভিতর হ'তে জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা উজ্জ্বল করা যায়, তাহা হইলে তাহা চুম্বক হইয়া যায়। জ্ঞানক্রিয়ার ফলে অন্তরাত্মার (=প্রত্যগাত্মার) চিৎকলা একটু একটু করিয়া ফুটিতে থাকে, তাতেই উপাধি উজ্জ্বল ও আকর্ষক হয়। তখন বাহিরের স্বাংশ সত্ত্বকণা-সকল আকৃষ্ট হইয়া ভিতরে ঢুকিতে থাকে, ভূতকণা চলিয়া যাইতে থাকে। ক্রমশঃ উপাধি নিজের সত্ত্বে ভরিয়া যায়, বাহ্য ভূতকণা চলিয়া যায়—চিৎকলা দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া পড়ে।

ভক্তির পথ পৃথক্। এক্ষেত্রে উপর (ঈশ্বর পরমাত্মা) হইতে কলা উপাধিতে নামে—অবশ্য কৃপারূপে। ইহা অতি প্রবল কলা। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য করিলেই তাঁহা হইতে কলা নামিয়া আসে। ফলে একদিকে আত্মকলার —জ্ঞানের—স্ফূর্তি হয়, অপরদিকে ভূতকণার অপসারণ ও সত্ত্বকণার প্রত্যা-কর্ষণ বাহির হইতে সিদ্ধ হয়।

জ্ঞানের দ্বারা কৃপাকে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে কৃপা চলিয়া যায়—তখন জ্ঞানও থাকে না। এইজন্যই জ্ঞান না হইয়া ভক্তি হ'লে তাহার ফল স্থায়ী হয় না। ভক্তি থাকিলে কৃপাবৃষ্টি হইবেই, কিন্তু জ্ঞান না থাকিলে তাহা অনিত্য। জ্ঞান ভিন্ন কৃপাকে ধরিয়া রাখিতে কেহ পারে না। তদ্বৎ কর্ম-ব্যতিরেকে জ্ঞান হইলে সে জ্ঞানকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা অস্থায়ী হয়। সে জ্ঞান হইলে অবশ্য উপাধি শুদ্ধ হয় বটে, সত্ত্বকণ ফিরিয়া আসে ও ভূত-কণা চলিয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান অস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথাপূর্ব অবস্থা ফুটিয়া উঠে। কর্ম পূর্বে থাকিলে জ্ঞান অস্ত যায় না—কারণ, তেল জোটাতে পারলে প্রদীপ জ্বলিবে না কেন?

তেমনি বিন্দুস্থৈর্য্য ভিন্ন স্থায়ী কর্ম হয় না। কর্ম কাহারও অনুগ্রহে হইলেও স্থায়ী হয় না। ব্রহ্মচর্যই সেইজন্য কর্মের ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য দ্বারা বিন্দুসিদ্ধি হইলে কর্ম নিত্য হয়—স্পন্দ সদাকালীন হয়, তাই ভক্তি বা কৃপাও স্থায়ী হয়।

৬/১২/৩২

জপের সংখ্যা রাখার তত্ত্ব কি? সংখ্যা রাখা হয় সঙ্কল্পকল্পে। জপ নিরন্তর যখন হ'তে থাকে—তাহা অনাদি ও অনন্ত প্রবাহের মতন। যেমন ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারা—স্বভাবতঃই চলিতেছে। তাকে সীমাবদ্ধ না করিলে, গণ্ডী না দিলে, অহম্ বা আলয়রূপে স্ফূর্তি হ'তে পারে না। তেমনই নিরন্তর প্রবাহশীল জপধারাতে গণ্ডী দিলে তবেই ত' তাহা আমার হ'তে

পারে। ইহা কৃত্রিম বটে, কিন্তু সকাম কর্মমাত্রই কৃত্রিম। সিদ্ধ অবস্থায় যে জপ চলে, তাহা স্বাভাবিক। তাতে সংখ্যা থাকে না। তাহাতে অহং যোগ করিয়া আপন করিয়া নিতে নাই। কেবল দ্রষ্টা হইয়া প্রবাহটি দেখিয়া যাইতে হয় মাত্র। তার ফলাফল নাই। কারণ, বোধবশতঃ কর্তৃত্বাভিমান আমাতে নাই। আমি তার ভোক্তাও নহি। তাহা প্রকৃতির খেলা মাত্র।

কিন্তু আমি যখন ভোক্তা তখন তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতেই হইবে—পুরুষকার দ্বারা তাহাকে মম করিয়া নিতে হইবে। নতুবা তাহা ভোগ্য হইবে না।

কয়েকটি অবস্থা—

সকাম কর্তাঃ—(ক) ক্রিয়া হইতেছে। কর্তা আমি। ফলের ভোক্তাও আমি।

জ্ঞানীঃ—(খ) ক্রিয়া হইতেছে। দ্রষ্টা আমি। ফল নাই—ভোক্তাও নাই। দৃশ্য আছে।

ভক্তঃ—(গ) ক্রিয়া হইতেছে। দ্রষ্টা আমি, ভোক্তা আমি এবং প্রযোজ্যকর্তা আমি। ফল নাই—আনন্দের আস্বাদন-রূপ ভোগ আছে। তাঁর দেওয়া।

পূর্ণঃ—(ঘ) ক্রিয়া হইতেছে। দ্রষ্টা আমি নাই। ফলের ভোক্তাও আমি নাই। এখানে কর্তা নাই, ভোক্তা নাই। আনন্দ আছে—তার আস্বাদন নাই। স্বভাব।

ক্রিয়া নিত্য (অব্যক্ত ও ব্যক্ত)

জীব	ঈশ্বর—পূর্ণ
(ক) কর্তা ও ভোক্তা। [দ্রষ্টা নহে। কর্ম ও ফল, উভয় আছে।]	(ক) দ্রষ্টামাত্র
(খ) দ্রষ্টামাত্র—কর্তা নহে, ভোক্তা নহে।	(খ) দ্রষ্টামাত্র
(গ) দ্রষ্টা ও ভোক্তা—প্রযোজ্যকর্তা। [ভগবদ্দত্ত ভোগের ভোক্তা। এ ভোগ তার কর্মফল নহে। ভগবান্ জীবকে কাজ করান, আনন্দাদিও দেন—জীব যন্ত্রবৎ করে। জীব পরতন্ত্র—এটা জীব বোঝে। সে কর্তা হ'লেও	(গ) প্রয়োজক কর্তা = কারয়িতা।

জীব	ঈশ্বর—পূর্ণ
স্বতন্ত্র নহে। কারণ ভগবানকে দেখতে পেয়েছে। কর্মফল নাই—তাই ফলভোগ নাই। তার সুখ-দুঃখ প্রারব্ধ ফল নহে। ভগবানের ইচ্ছাজন্য।]	
দ্রষ্টা ও ভোক্তা—কর্তা নহে।	দ্রষ্টা। কর্তা।

২৮/৬/৩৩

জীবলিঙ্গই শিবলিঙ্গ হয়।

কি করে লিঙ্গ-নির্মাণ হয়? মধ্যে নাড়ীপথ—পথের একদিক্ হ'তে তেজোরাশিকে ঠেলা দিয়া পথ দিয়া ঊর্ধ্বমুখে সঞ্চার করে। উপরদিক্ হ'তেও ধাক্কা নামিয়া আসে। ফলে, দু'দিক্‌কার চাপে মধ্যসঞ্চারশীল তেজঃ অণ্ডাকার প্রাপ্ত হয়, উভয় পার্শ্বে ফুলিয়া যায়। ইহাই লিঙ্গ।

জীবলিঙ্গের লয়ে যেমন জীব থাকে—শিবলিঙ্গের লয়ে তেমনি শিবই থাকেন।

জীবের চিহ্ন জীবলিঙ্গ—তেমনই শিবের চিহ্ন শিবলিঙ্গ।

লিঙ্গ অব্যক্ত হ'লে যেমন জীবকে চেনা যায় না, তেমন লিঙ্গ অব্যক্ত হ'লে শিবকেও চেনা যায় না।

মূলাধার ভেদ করিলে শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়।

১০/১২/৩২

কেন্দ্রে যেমন সকল radius এক, তেমনি কারণ-বিন্দুতে সকল শক্তি এক। এই শক্তিগুলিকে বিচারার্থ রেখা বা রশ্মি বলিয়া ধরা যাউক। এই-গুলি মূলবিন্দুতে এক। নানা রেখার নানা প্রকার সংযোগে জগতের ভাব ব্যক্ত হয়। সরলরেখা যেখানে একাকার, সেখানে সকল ভাবই মহাভাবরূপে এক হ'য়ে আছে। মনে কর—কারণবিন্দুতে ৫০টি বর্ণ বা রশ্মি এক হ'য়ে আছে। তাহা হ'তে ক ল প স ম এই পাঁচটি বর্ণ এই ক্রমে বাহির হ'য়ে আসিলে এই শব্দের বাচ্য কর্পূর-বিন্দুরূপে ব্যক্ত হইবে। ক ল প স ম এই পাঁচটি বর্ণ একটি স্ফোটের ব্যঞ্জক। ইহার অর্থ camphor. কার্যবিন্দু কর্পূরের বিন্দু। বহিঃপ্রবাহবশতঃ ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে।

অন্য বর্ণের অন্য সম্মিলনে জলাখ্য কার্যবিন্দুও ঐ কারণ-বিন্দু হ'তেই

ব্যক্ত হয়। পূর্ণের সঙ্গে কারণ-বিন্দুর অস্পর্শ যোগ আছে। তাই নিরন্তরও কার্য-বিন্দুর পুষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয়।

কার্যবিন্দুর আবির্ভাব ও প্রণালী জানা আবশ্যক। কারণ-বিন্দু হ'তে নির্দিষ্ট বর্ণগুলি নির্দিষ্টক্রমে কেন আবির্ভূত হয়? কারণ-বিন্দুর নিজ-স্বাতন্ত্র্য হ'তে পারে। সম্ভবতঃ তাহাই প্রথম সর্গের মূল। আদি সৃষ্টির পরে তাহা ইচ্ছামূলক। অর্থাৎ কর্পূরের ইচ্ছা করিলে তবেই কারণ-বিন্দু হ'তে শুধুই কর্পূর হবে—অর্থাৎ কারণ-বিন্দু কর্পূর নামক কার্যবিন্দু-রূপে পরিণত হবে। কিন্তু এই ইচ্ছা করিবার পূর্বেই কর্পূর হইয়াছিল, বলিতে হইবে। নতুবা তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হইল কি করিয়া? সুতরাং ইচ্ছাসর্গের পূর্বেই মূলসৃষ্টি বা কার্যবিন্দুর সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। ইচ্ছার ফলে যে সৃষ্টি হয় তাহা এই প্রকার—ইচ্ছা যাহার, সে কারণের সহিত একাত্মক হয় (=জ্ঞান, অভেদভাব) বলিয়া ইচ্ছাবশতঃ নিজাত্মা হ'তে অর্থাৎ কারণ-বিন্দু হ'তে ইচ্ছার আকার বাহির হ'য়ে যায়—অর্থাৎ কর্পূরাদি ভাব কার্যবিন্দু-রূপে বাহির হয়। বাহিরে কর্পূর pre-exist না করিলে ভিতর হ'তে কর্পূর বাহির হবে না। তেমনই ভিতরে কর্পূর না থাকিলে বাহিরের কর্পূরে কর্পূরের স্ফুরণ হবে না। নিজাত্মা হ'তে কর্পূর বাহির হওয়া মানে—সেই সকল বর্ণ সেই সেই ক্রমবিন্যাসে বাহির হইয়া পড়ে—বাহিরে আসিয়া ব্যক্ত কর্পূর হয়। ভিতরে আত্মাতে উহা potency রূপে মাত্র ছিল। ইহাই ইচ্ছা-শক্তিমূলক সৃষ্টি।

এখন কথা এইঃ যখন কারণ-বিন্দু হ'তে ইচ্ছাবশতঃ (মুখ্য ইচ্ছা= স্বাতন্ত্র্য as in আদি সর্গ অথবা গৌণ ইচ্ছা as in the সৃষ্টি of ঈশ্বর বা যোগী) কর্পূর হয়—অর্থাৎ সেই সেই বর্ণ সেই সেই ক্রমে বাহির হয়, তখন তাকে ধরে কে? ইহাই আধার। ইহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলে। ইহা তমোরাজ্যেও অপ্রকটভাবে আছে। বর্ণ বাহির হওয়া মাত্রই ব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বের কোলে পতিত হয়—ইহাই গর্ভে বীজপাত। শুদ্ধসত্ত্ব স্পন্দময়। ইহা সাদা আলো। ইহাই প্রণব-জ্যোতি। ইহাতে একটি বর্ণ পড়িলে ইহা তদাকারে পরিণত হয়। তাহাতে আর একটি বর্ণ আসিয়া পতিত হয়। এইরূপে শেষ বর্ণ আসিয়া পড়িবামাত্রই বাচক শব্দ অভিব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বা কর্পূর-বিন্দুও ফুটিয়া উঠে। প্রতি বর্ণেই আংশিক ভাবে কারণ-বিন্দুসহ একাত্মক কর্পূর ভাব ব্যক্ত হয়, কিন্তু তাহা কার্যজগতে নহে, শক্তিজগতে—শেষ বর্ণে কারণ-বিন্দুরূপ কর্পূরের অভিব্যক্তি পূর্ণ হয়। তাই সেই অবস্থাই কার্যবিন্দুরূপ কর্পূর।

বর্ণ পর পর আকর্ষণ করিয়া আনিলে সঙ্গে সঙ্গে কারণ-কর্পূরভাব

অভিব্যক্ত হইবে। কারণ-কর্পূর অবতীর্ণ হইতে থাকিলে সেই সেই বর্ণ সেই সেই ক্রমে আপনিই স্ফুরিত হইবে।

১৫/১/৩৩

"রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ"। এই ষষ্ঠাংশই 'বলি' বা 'কর'।

প্রজা=জীব। জীবের ভোগ্য বা আহরণীয় বস্তুর ষষ্ঠ অংশ রাজাতে পৌঁছায়। ইহা সারতম রস।

প্রথম অংশ। বীর্য্য—ইহা অন্নময়কোষের পোষক।

দ্বিতীয় " । ওজঃ বা প্রাণ—ইহা বীর্য্যের সার ও প্রাণময়কোষের পোষক।

তৃতীয় " । মনঃ—ইহা মনোময় কোষের পোষক।

চতুর্থ " । বিজ্ঞান—ইহা বিজ্ঞানময় কোষের পোষক।

পঞ্চম " । অমৃত—ইহা আনন্দময় কোষের পোষক।

ষষ্ঠ " । চিৎকলা—ইহা রাজার প্রাপ্য। অমৃতও জড়—সত্ত্ব বা বিন্দু। তাহার মধ্যে যে চিদংশ, তাহাই চৈতন্যময় ঈশ্বর বা রাজার প্রাপ্য। ইহাই 'ষষ্ঠ অংশ' বা 'বলি'।

ইহা অনুলোম গতি।

বিলোমক্রমে রাজা হ'তে ইহা সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই কণ বিশাল হইয়া ফেরে।

চিৎ-শক্তি প্রসাদভাবে নামিবার সময় অমৃতরূপে কারণস্থ জীবের তর্পণ করে। কারণস্থ জীবের প্রসাদ বা উচ্ছিষ্ট নামিয়া বিজ্ঞানের তৃপ্তি করে। বিজ্ঞান হ'তে প্রসাদরূপে নামিয়া মনের, মন হইতে নামিয়া প্রাণের তর্পণ করে। ইহাই সূক্ষ্মদেহী জীবের ভোগ। প্রাণের উচ্ছিষ্ট অন্নময়-কোষে সঞ্চারিত হয় ও তাহার তর্পণ করে। ইহা স্থূলদেহীর ভোগ।

"যদ্ দত্তং তদ্ ভুক্তম্"। ইহাই যজ্ঞাশিষ্টাসন। এই ভোগ না পাইলে কল চলিতে পারে না।

প্রত্যেক স্তরেই অগ্নির দুইটি রূপ আছে। এক—অগ্নিতে বাহ্য ভোগ্য হুত হয়, তার অসার পৃথক্ হয়, সার উত্থিত হইয়া উপরের স্তরে যায়। এই সারাংশ জোর করিয়া সেখানে রাখিয়া দেওয়া চলে না, দিতে গেলে কল খারাপ হইবেই। দ্বিতীয়—অগ্নিতে উপর হ'তে অবতীর্ণ আনন্দ ভোগ্য-রূপে গৃহীত হয়। ইহা ভোগার্থ। প্রথমটি বিবেকাগ্নি, দ্বিতীয়টি ভোগাগ্নি।

প্রথম অগ্নি সকল অসারকে পৃথক্ করিতে পারে না—নিজের শক্ত্যনুরূপ পারে। প্রথম অগ্নির ধারার উদ্দেশ্য—জড় হ'তে শুদ্ধ চিদংশ সরাইয়া

চিন্ময়ের সঙ্গে যুক্ত করা। দ্বিতীয় অগ্নির ধারার উদ্দেশ্য—চিৎ-শক্তি হ'তে আপন ভোগ্যাংশ বাছিয়া গ্রহণ করা, বাকিটুকু ভারী বলিয়া নীচে নামিয়া পড়ে। এই প্রকার নিম্নতম দ্বিতীয় অগ্নিতে তার ভোগ্যাংশ গৃহীত হ'লে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পুনর্বার বাহিরে সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া যায়। ফলতঃ জগতের আপ্যায়ন হয়। এইভাবে জীব জগৎ হ'তে যতটা নেয়, তাহার সহস্রগুণ জগৎকে ফিরাইয়া দেয়।

ইহাই সেবা বা পরোপকার।

প্রত্যেক স্তরেই এই পরোপকার হইয়া থাকে।

২৯/৯/৩৩

জগতে সবই গতিযুক্ত। স্থূলবস্তুর Velocity যতই বাড়িবে, ততই তাহার স্থূলতা কমিবে—সূক্ষ্মতা বাড়িবে। ঠিক ঠিক light-এর Velocity পাইলে তাহা তেজোময় হইয়া যাইবে। তাহা practically একই সময়ে জগদ্-ব্যাপক হইয়া পড়িবে। Velocity পরিমিত থাকিলে space থাকে—তাই তাহার লঙ্ঘন আবশ্যক হয়। কিন্তু Velocity অনন্ত হইলে space থাকে না, matter-ও থাকে না। তাহা শুদ্ধতেজ বা জ্যোতি বা চৈতন্য। গতি অনন্ত বলিয়া তাহা স্থির।

গতি যতই মন্দ, ততই স্থূলতা। গতি যেখানে শূন্য, সেখানে শুদ্ধ জড়ত্ব। গতি যেখানে অনন্ত, সেখানে শুদ্ধ চৈতন্য। এ উভয় একই—অথচ দুইদিকে লক্ষণীয়। সান্ত ভূমিতে চেতন ও জড়-বিভাগ। চেতনে গতি বেশী, জড়ে গতি কম। যেখানে গতি লক্ষিত হয়, তাহাই চেতন—যেখানে হয় না, তাহাই জড়। বস্তুতঃ জগতের সব বস্তুই চেতন। আবার সব চেতনেই জড়ত্ব আছে।

৫/১/৩৪

মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে প্রতিভাস হয়—যাহা চিন্তা করা যায়, তাহা যেন দেখা যায়—তাহা বাস্তবিকই দেখা যায়। চিন্তাও দেখাই। তবে বস্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আসিয়া চলিয়া যায়। তার কারণ—বেগের তীব্রতা। অত্যন্ত অধিক বেগ বলিয়া ধরে রাখা যায় না। এই যে বস্তু, ইহা সাকার। আকার আছে ব'লেই বোঝা যায়, বিষয়ত্ব ফোটে। বেগসত্ত্বেও বুঝা যায়।

বস্তু = সত্ত্ব।

বেগবতী-ক্রিয়া = রজঃ।

আকার = তমঃ।

বেগ যতই কমিয়া আসিবে, ততই আকার সৃষ্ট হইবে—অর্থাৎ প্রতিভাস বেশ ভাল বুঝা যাইবে। বেগ কমাবার দুই উপায় আছে—

(ক) এক—ব্যাপক সত্ত্বের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের পূর্বে।

(খ) দ্বিতীয়—উহার পরে।

প্রথমাবস্থায় বিষয়-প্রতিভাস স্পষ্ট হয়—তবে উহা আভ্যন্তর—*ideal*. শুধু নিজের প্রত্যয়যোগ্য প্রাতিভাসিক।

দ্বিতীয়াবস্থায়ও উহা স্পষ্ট হয়—তবে উহা বাহ্য—real. সকলের গোচর। ব্যাবহারিক।

৪/২/৩৪

প্রলয় = জ্ঞাননাশ ও দেহনাশ।

দৈনন্দিন প্রলয় = মৃত্যু। তাহাতে জ্ঞান ও দেহ নষ্ট হয়। যে দেহাবচ্ছেদে জ্ঞান চল্‌ছে, সে দেহ থাকে না, সে জ্ঞানও থাকে না।

এইটিকে কাটাইতে পারিলে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহা কল্পস্থায়ী। অর্থাৎ ব্রহ্মার দিনগত প্রকাশ পাওয়া যায়। যদি কেহ জীবিতকালে ঐ কল্প-তেজঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কল্পজীবি হবে—দেব-ভাব প্রাপ্ত হবে। অবশ্য ক্রম আছে। কল্পপ্রলয়ই পরমাবধি। এই তেজের অপর ও পর, দুইটি অংশ আছে—একটি দ্বারা দেহকে অবিচ্ছিন্ন রাখা যায়, কিন্তু জ্ঞানকে রাখা যায় না। আর একটি দ্বারা জ্ঞানকেও রাখা যায়। যে অপর তেজঃ প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞানহীন হয় বটে, কিন্তু দেহ হারায় না। ইহা একজাতীয় প্রকৃতি-লয়। যে পর-তেজঃ পায়, সে জ্ঞানও হারায় না, দেহও হারায় না। ইহাই একজাতীয় প্রকৃতি হ'তে মুক্তি। অপর বা পর উভয়েরই মাত্রা আছে। এইজন্য গতিতে ও স্থিতিতে ভেদ হয়। পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রত্ব—কল্পান্তে স্থিতি। এই পূর্ণমাত্রা মানে কি? ত্রিলোকীতে যে সত্ত্ব ব্যাপ্ত আছে, তাহার সমষ্টি বা সারতমাংশেই পূর্ণসত্ত্ব। ইহা সত্ত্ব বা সোমের চারি কলা।

যোনি বা দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়াই শক্তির বিকাশ হয়।

(১) পরম—ইহার দ্বারা কল্পদর্শন হয়।

(২) বিশুদ্ধ—ইহার ফলে প্রকৃতি লীন হয়। শুধু চৈতন্যই থাকে। প্রকৃতি চিতের স্বাতন্ত্র্য-রূপ ধারণ করে। এই আলোকে সম্বন্ধ নাই।

(৩) শুদ্ধ—ইহার দ্বারা ব্রহ্মার মৃত্যু (=প্রাকৃতিক লয়) দেখা যায়। ব্রহ্মাণ্ড লয়ের সাক্ষী হওয়া যায়। ব্রহ্মা বিদেহমুক্ত হ'লে এই তেজঃ প্রাপ্ত হন। যিনি জীবিতকালে ইহা প্রাপ্ত হন, তিনি ব্রহ্মাপেক্ষাও ঊর্ধ্বস্থ। এই আলোকে দেখা যায় যে, যাবতীয় বিকার প্রকৃতিতে মিশাইয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ড ভগ্ন হ'ল। কেবল প্রকৃতি থাকিল। এই আলোকে কালভেদও নাই, কারণ ক্রিয়া নাই। তবে স্পন্দ থাকে। ইহা নিত্য।

(৪) মহাকল্প—ইহার দ্বারা কল্পান্ত প্রলয় বা নৈমিত্তিক প্রলয় বা ত্রিলোকী নাশ দেখা যায়। এই আলোক পাইলে জীব ব্রহ্মদেহ লাভ করে; ব্রহ্মার মতন হয়। অবশ্য স্তর আছে। এই ব্রহ্মাই পুরুষ, বৈশ্বানর, লিঙ্গ, মহৎ। ইহার দুইটি ভাগ আছে—একভাগে জন, তপঃ ও সত্যলোক ভাসছে; অপরভাগে মহর্লোক। ত্রিলোকী নাশের পর মহর্লোক ঘুমাইয়া বা জ্ঞান হারাইয়া যায়, ঊর্ধ্ব তিন লোক জেগে থাকে। বস্তুতঃ ঊর্ধ্ব তিন লোকই পুরুষের ঊর্ধ্ব তিন অঙ্গ—ত্রিবর্ণ। মহর্লোক শূদ্র, জ্ঞানহীন হ'লেও ব্রহ্মার দেহ। এই মহাকল্প-লোকে দিনরাত ভেদ নাই—সর্বদাই প্রকাশ। তবে কাল-ভেদ আছে—ব্যুত্থান ও নিরোধ—ক্রিয়াযুক্ত ও ক্রিয়াহীন দশা।

(৫) কল্প—ইহার দ্বারা দৈনন্দিন বা নিত্য-প্রলয় বা মৃত্যু (ব্যষ্টি) দেখা যায়। ইহাই ব্রহ্মার দিনগত আলো। এই তেজঃ পাইলে অমরত্ব লাভ হয়। দেবত্ব। ব্যষ্টি-মৃত্যু কেটে যায়—কল্পান্তকাল অবধি আয়ু হয়—কম বা বেশী ইহারই মধ্যে।

২৭/২/৩৪

ভিতর ভাবময়; বাহির ভূতময়। ভিতর ও বাহিরের যোজক প্রাণ।

শ্বাস-প্রশ্বাসের যোগে ভিতর বাহিরে আসছে, বাহির ভিতরে যাচ্ছে। সৃষ্টি-লয়ের ইহাই রহস্য। প্রাণ রুদ্ধ হ'লে ভিতর ভিতরই—বাহিরের সঙ্গে যোগ থাকে না। তদ্রূপ বাহির বাহিরই।

ভাবকে বায়ুপ্রবাহে বাহিরে আনলেই তা প্রত্যক্ষ হবে। বাহ্যদৃশ্যকে বায়ু-বলে ভিতরে নিলেই তা অপ্রত্যক্ষ হবে।

তবে ব্যষ্টিভাবে—তাই subjective.

তবে সমষ্টি করিতে পারিলে ব্যাবহারিক সৃষ্টি বা লয় হ'তে পারে। ইহার অর্থ এই যে—সমষ্টি না করলে সকলের প্রাণগোচর হ'তে পারে না। এই

analogy-তে ভাবকে চারজনের কাছে দৃশ্য করতে হ'লে তাকে স্ব-বাহ্য করিয়া পরে ঐ চারজনের উপাদান-মাত্রায় আংশিক সমষ্টি করিতে হয়। ইহাই mass hypnotism-এর মূল principle.

প্রকৃত সমষ্টি বা বিরাটের সঙ্গে নিজের যোগ না হ'লে ব্যাবহারিক সত্তা হয় না।

এইজন্যই ব্যাবহারিক বস্তুমাত্রেই জগতের সব আছে। প্রাতিভাসিক জিনিসে ঠিক তাহা নাই।

২/৩/৩৪

সাধারণ দর্শনের সময় চিৎ-এর প্রভা মন-এ যাইয়া পড়ে। মনের প্রভা চক্ষুতে পড়ে। চক্ষুর প্রভা বিষয়ে পড়ে। যখন কোন জিনিস দেখিতে দেখিতে মন তন্ময় হয়—অর্থাৎ চক্ষুর প্রভা গুটাইয়া বিষয়াকার মাত্র হয়, মনের প্রভাও তাই হয়, অর্থাৎ যখন চক্ষুর প্রভার রেখা ও মনের প্রভার রেখা সমান হয়, সমসূত্র হয়—তখন বাহিরের বস্তুটি সরাইয়া লইলেও দৃশ্যরূপে তাহার দর্শন হইতেই থাকিবে। অর্থাৎ বিষয়াকার চিত্তই তখন দৃষ্ট হইবে। তখনকার দৃশ্য বিষয় বস্তুতঃ মনোময় বা ভাবময়। তদ্রূপ মন ও অ-জ্ঞান যখন সমসূত্র হয়, তখন দৃশ্য অ-জ্ঞানময় হয়। তখন জগৎ অ-জ্ঞানময় হয়। এই অবস্থার পরেই জগৎ চিন্ময় বুঝা যায়।

স্থূল অবস্থায় বাহ্য-জগৎ ইন্দ্রিয়ের বিকার, লিঙ্গাবস্থায় উহা মনের বিকার, কারণাবস্থায় উহা অ-জ্ঞানের বিকার—ইহার পর বাহ্যজগৎ আত্মারই বিলাস।

ইন্দ্রিয়ের প্রভা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, তাতে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তাহাই বাহ্যজগৎ। এই প্রভাই মহাকাশ বা ভূতাকাশ। ইহা পাঁচটি। এই পাঁচটির সমষ্টি যাহা তাহাই প্রকৃত ভূতাকাশ। তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই চিত্তাকাশ উপলব্ধ হয়। চিত্তাকাশের তরঙ্গই ভাব—তাহাও সাকার।

চিত্তাকাশে তরঙ্গ না উঠিলে ভূতাকাশে তরঙ্গ উঠিতে পারে না।

কারণ-বিন্দু বা অব্যাকৃতাকাশে স্পন্দন না উঠিলে চিত্তাকাশে তরঙ্গ উঠিতে পারে না।

মহাকারণের স্বাতন্ত্র্য হ'তেই কারণে কম্পন হয়। কারণের কম্পন মানে প্রয়োজন বা অভাব-বোধ। স্বভাবে অভাবের উন্মেষ। ইহার স্বরূপ প্রার্থনা বা ইচ্ছা i. e. 'ফুল চাই'। ইহা অত্যন্ত অস্ফুট। ইহার মূলে অ-জ্ঞান আছে।

কারণ নিজেকে ভাঙিয়াছে বলিয়াই অভাব হইয়াছে—চাওয়া-ভাব জাগিয়াছে। ইহাই বীজ। ইহা চিত্তাকাশে পড়িবামাত্রই ভাবরূপে ফুটিয়া উঠে (=Ideal flower), যাহা চিত্তের তরঙ্গবিশেষ। এই ভাব যদি ভূতাকাশে পতিত হয়, তবে স্থূল পদার্থের বা ভৌতিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এইবার কারণ কার্য-রূপে অভিব্যক্ত হইল। অভাব হইতে ভাব আসিল। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ইচ্ছা-শক্তি ফলপ্রসব করিল। ইহাই সৃষ্টির রহস্য।

ইহার পর সম্ভোগ বা স্থিতি। যে ফল প্রসূত হইল, তাহা ভোগের জন্য। তাহার ভোগ হইলেই তদ্বিষয়ক বৈরাগ্য আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে—ভোগ্যের সংহার-কাল আসিয়াছে। ফলতঃ ভোগ্য ভৌতিক ভাব পরিহার করিয়া ভাবময় রূপ গ্রহণ করে। পরে ঐ রূপও গুটাইয়া কারণ-রূপ ধারণ করে। তখন ভোক্তা ও ভোগ্য সমভূমিস্থ হইয়া পড়ে। ইহার পরেই লীলা শেষ হইয়া যায়। মহাকারণে ভোক্তা ও ভোগ্য নাই। চৈতন্য বা দ্রষ্টা আছে। দৃশ্যের সহিত, শক্তির সহিত অভিন্ন। মহাকারণই ভোক্তা হইয়া কারণে নামেন, পরে ভোগকরণের বিকাশ করিয়া ভোগ্যের সৃষ্টি করেন। ক্রমে ভোগ্যের আস্বাদন করিতে করিতে ভোগ্যকে উঠাইয়া লন, শুদ্ধ করিয়া লন, স্থূল হ'তে লিঙ্গে, সেখান হইতে কারণে উত্থাপন করেন। এই সংহারের পরে ভোক্তা ও ভোগ্যের একটা কালাতীত বা মহাকালস্থ সম্ভোগ হইয়া থাকে—ফলে দুই একাকার হইয়া—শৃঙ্গারের ফলে—কারণের অতীত হইয়া পড়েন। দ্রষ্টা হন, স্বশক্তির সহিত অভিন্ন। যেমন মহাকারণ, এও তদ্রূপ হয়। ইহাই বোধহয় সাম্য। ইহা অদ্বয়-ভাব।

পূর্ণের মধ্যে এই লীলা নিত্য চলিতেছে।

ব্যষ্টি কখনও ব্যষ্টি থাকিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। আমি যে স্থূলজগৎ দেখিতেছি, তাহা একপক্ষে আমার স্থূলাকাশের তরঙ্গস্বরূপ, অপরপক্ষে যে যে দেখিতেছে বা দেখিবে, সকলেরই স্থূলাকাশের তরঙ্গ—মূলতঃ তাহা সমষ্টি স্থূলাকাশের তরঙ্গ। আমার চিত্ততরঙ্গ বা ভাব হইতে আমার ব্যষ্টি স্থূলাকাশে তরঙ্গ উঠিতে পারে, সমষ্টিতে পারে না। তেমনই আমার ব্যষ্টি স্থূলদৃশ্য তিরোহিত হইলেও সমষ্টি আকাশের তরঙ্গ শান্ত হয় না বলিয়া বাহ্যজগৎ লুপ্ত হয় না। কাজেই ব্যষ্টিধারা ধরিয়া যদি আমি স্থূল হ'তে লিঙ্গে যাই, লিঙ্গ হ'তে কারণে যাই—তা হ'লেও প্রকৃতভাবে যাওয়া হ'তে পারে না। বস্তুতঃ আমি ব্যষ্টিভাবে পূর্ণমাত্রায় লিঙ্গে স্ব-বোধ রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে পারি না। ব্যষ্টিভাবে যে লিঙ্গে যায়, সে লিঙ্গে অভিভূত হইয়া পড়ে।
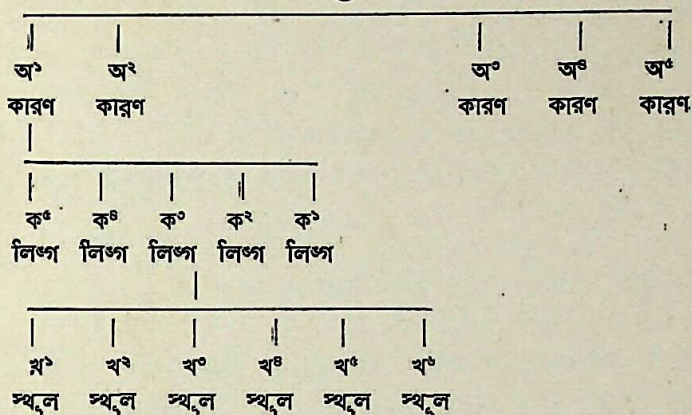
একটি লিঙ্গ হ'তে বহু লিঙ্গ-রাশি বাহির হইয়া প্রত্যেক হ'তে এক একটি স্থূল বাহির হইয়াছে। যেমন ক১ লিঙ্গ হ'তে খ১ খ২ প্রভৃতি স্থূল বাহির হইয়াছে। অতএব খ১ ক১-তে বিলীন হইলেও সে বস্তুতঃ ক১-এর সঙ্গে অভেদ বোধ করিতে পারিবে না। খ২ খ৩ খ৪ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অভেদ বোধ করিতে পারিলে তবে সে পূর্ণমাত্রায় ক১ হইতে পারে—ক১-এর অহম্‌-কে প্রাপ্ত হ'তে পারে। পূর্ণ ক১ স্বকীয় রশ্মি ধরিয়া অ১-এ গেলে ঠিক অ১-কে পায় না। তাকে ক২ ক৩ প্রভৃতির সঙ্গে অভিন্ন হইয়া তবে পূর্ণমাত্রায় অ১ হইতে পারে। ক২ ক৩ প্রভৃতি হইতে যে সব স্থূল বাহির হইয়াছে তাহা পৃথক্‌ভাবে সংহার করিতে হয় না। স্বাভাবিক সংহার-কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। অথবা উহার সাহায্য করিতে হয়।

অর্থাৎ যতটা পারা যায় স্থূলকে ব্যাপকভাবে গুটাইতে হয়। পরকে আপন করিয়া—দীক্ষাদি দ্বারা পরে লিঙ্গমণ্ডলে অন্যান্য স্থূল উঠিবার কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হয়। অথবা তাহাকে উঠাইতে সাহায্য করিতে হয়। যখন স্বকীয় লিঙ্গ-নিঃসৃত যাবতীয় স্থূল উঠিয়া যাইবে, তখন পূর্বোক্ত নিয়মে অন্যান্য সমধর্মা লিঙ্গকে আপন করিয়া অভিন্নভাবে ব্যাপকভাবে স্ব-কারণে উঠিতে হয়। সেখানে উঠিয়া স্ব-কারণনিঃসৃত যাবতীয় লিঙ্গের পুনরাগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হয় অথবা তাহাদিগকে উঠিতে সাহায্য করিতে হয়। সব উঠিয়া গেলে তখন অন্যান্য সমধর্মা কারণকে আপন করিয়া অভিন্নভাবে ব্যাপকভাবে এক হইয়া মহাকারণে উঠিতে হয়। ইহাই চরমাবস্থা।

মহাকারণ হইতে এক হইয়া বাহির হইয়াছিল—পরে বহু হইয়াছিল। আবার এক হইয়া একের অতীত অবস্থায় পৌঁছে।

৬/৩/৩৪

(১)

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন"।

বেদের আলো যতদূর, ততদূর ত্রিগুণ। তার পর বেদও নাই, গুণও নাই—সেই স্থানেই যেতে হবে।

যে আলোতে গুণগুলিকে এক প্রকার দেখা যায়, পৃথক্ পৃথক্ দেখায় না, তাহাই মূল বেদ। তাহা অবিভক্ত, অব্যস্ত। যাহা তাহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতি। ইহাকে বিন্দু বলিতে পারি।

বিভাগ হইলে আলো তিন প্রকার হয়—মূল যাহা, তাহা অবশ্যই প্রতি বিভাগে থাকেই। আলো ভিন্ন হয় বলিয়া দৃশ্যও তিন প্রকার দেখায়। ইহাই তিন গুণ।

এই তিনটি আলো বিভক্ত হইয়াও পরস্পর মিশ্র থাকে—কারণ মূল এক—তবে এক এক আলোতে এক একটা প্রধান থাকে মাত্র। গুণও তাই।

বেদের অবিভক্ত আলো বিভক্ত হইবার পরেই কলিযুগ আসে।

(২)

সূর্যই বেদের রূপ। তাই বেদের অতীত হওয়াও যা, সূর্যমণ্ডল ভেদ করাও তাই। বেদ বা সূর্য হইতেই প্রপঞ্চ বা সৃষ্টির আবির্ভাব, আবার উহাতেই তিরোভাব। ইহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্তি নাই। বেদ বা সূর্যের পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা জানাই জ্ঞান।

সুতরাং তিনটি স্তর পাওয়া গেলঃ—

১। বেদের অতীত=চৈতন্য বা আত্মা =ব্রহ্ম।

২। বেদ-ভূমি=দেবতা বা শক্তি =দ্বিজ।

৩। বেদের বাহির=প্রপঞ্চ বা ভৌতিক জগৎ =শূদ্র।

১০/৩/৩৪

প্রথমে লক্ষ্য স্থির ক'রে—পরে চলিতে থাক। দৃষ্টি যদি লক্ষ্যে থাকে তবে যতই বেগে চলিবে, তত শীঘ্রই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে। দৃষ্টি লক্ষ্যে না থাকিলে শুদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হয় না। কারণ, বে-রাস্তায় বেশী চলিলেও সে চলার দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তির সহায়তা হয় না।

লক্ষ্য স্থির করা কারণের কাজ—লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখা লিঙ্গের কাজ—চলা স্থূলের কাজ।

যতক্ষণ স্থূল স্মৃতি আছে, যতক্ষণ লিঙ্গ ও স্থূলে তাদাত্ম্য না হইয়াছে, ততক্ষণ শুদ্ধ লক্ষ্য দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না। কারণ, স্থূল প্রতিবন্ধক হয়। তবে লক্ষ্য স্থির করিয়া ও তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যু হইলে লক্ষ্যপ্রাপ্তির সহায়তা হয়। তবে স্থূলদেহে থাকাকালে লক্ষ্যভেদ করিতে হইলে স্থূলকে কাজ করিতে হইবে।

লক্ষ্য রাখা = ধ্যান

ক্রিয়া করা = জপাদি

এইজন্যই ধ্যানপূর্বক জপ। জপ করিতে করিতে ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়—তখন লক্ষ্যপ্রাপ্তি হয়।

বস্তুতঃ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া তাঁতে চিত্ত স্থির লাগাইয়া রাখিয়া যাহা করা যায়—তাহাই সহায়ক হয়। কারণ, লক্ষ্য ঠিক হইলে ভিতরে তাঁর সঙ্গে যোগা-যোগ হয়—তাই স্থূলদেহ যাহা কিছু করুক, তার মূলে তাঁর প্রভাব থাকেই। তখন পাপও পুণ্যের অধিক সাহায্যকারী হয়। কারণ সকল কার্যই ব্যবধানের নাশক হয়। ইহাই প্রারব্ধভোগ। তাঁর শক্তিই তখন জীবকে চালিত করে। তাঁকে দেখিতে থাকিলে আর জীবের কর্তৃত্ব কোথায়? লক্ষ্য চাই-ই।

ঊর্ধ্ব স্তরে দৃষ্টির সম্মুখে লক্ষ্যকে স্থাপন করা হইলে সদাই লক্ষ্য দর্শন হয়,—জীব স্থূলাভিমানী বলিয়া তাহা টের পায় না। তার কর্তব্য শুদ্ধ ক্রিয়া করা। সে যতই ক্রিয়া করে ততই ঐ দৃশ্যমান লক্ষ্য নিকটবর্তী হয়। তখন স্থূল আত্মা তাহা বুঝিতে পারে না। শুদ্ধ যে ক্রিয়া দ্বারাই লক্ষ্য নিকটবর্তী হয়, তাহা নহে—ভোগের দ্বারা, এমন কি, তথাকথিত কর্মদ্বারাও তাহাই হইয়া থাকে।

যখন দৃষ্টি ও স্থূলদেহ অভিন্ন হয়—স্থূল স্থূলত্ব হারাইয়া আতি-বাহিক ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ক্রিয়া থাকে না। যাহা থাকে তাহাই উপাসনা—শুদ্ধ দর্শন—দর্শন। দেখিতে দেখিতে দ্রষ্টা-দৃশ্য এক হইয়া যায়—সমাধি আসে, প্রজ্ঞার বিকাশ হয়। নিমেষহীন দৃষ্টিই উপাসনা। ইহাই রূপ-সেবা।

স্থূলাভিমান কাটিল কিনা তার নিদর্শন—লক্ষ্য-দর্শন স্পষ্ট হয়। যেমন, গোলাপ আমার লক্ষ্য—তাহা স্পষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলে তবে বুঝিতে হইবে —স্থূলের আচ্ছাদনটা তখন নাই; সুতরাং আর ক্রিয়া নাই। ক্রিয়া দ্বারা লক্ষ্য প্রত্যক্ষ হইবামাত্রই ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়। তখন স্থূল-বোধ মোটেই থাকে না। স্থূল-বোধ থাকিতে প্রত্যক্ষ হ'তে পারে না। এইজন্য beginner-এর পক্ষে

শুধু ধ্যান নিষ্ফল। সঙ্গে ক্রিয়া চাই—তাহা জপই হউক বা অন্য কিছুই হউক। তদ্বৎ ধ্যানহীন ক্রিয়া—জপাদিও—তাই।

ক্রিয়া করিতে করিতে যেমন ক্রিয়া থাকে না, দর্শন ফোটে—তদ্রূপ দেখিতে দেখিতে দর্শন থাকে না, ভক্তি ফোটে। তাহাই সমাধি। তারপর যাহা ফোটে তাহাই প্রকৃত বস্তু।

১০/৩/৩৪

একজনে ১০ মণ জিনিস উঠাইতে পারে না। ১০ জনে পারে। কারণ, ১০ জনের ব্যষ্টি-বল সমষ্টি হইলে (ক্রিয়াশক্তি) উঠাইবার সামর্থ্য হয়। ব্যষ্টি-বল পৃথক্ হইলেও মূলে ১ বলেরই অংশ মাত্র। সমষ্টির তারতম্যে সেই মৌলিক বলেরই কিয়দংশ অভিব্যক্ত হয়।

তদ্রূপ জ্ঞানশক্তিরও সমষ্টি হ'তে পারে। একজনের জ্ঞানশক্তিতে যাহা ধরা যায় না, তাহা ১০ জনের জ্ঞানশক্তি সমষ্টি করিলে তদ্বারা বুঝা যাইতে পারে। মূলে জ্ঞানশক্তিও একই আছে। আধার-ভেদে তাহারই বিকাশ।

জগতের মূলে ক্রিয়াশক্তি এক, জ্ঞানশক্তি এক, ইচ্ছাশক্তি এক।

২২/৩/৩৪

ইচ্ছাশক্তিতে জিনিস তৈয়ার করিবারও একটি প্রণালী আছে।

২৩/৩/৩৪

লক্ষ্যের সম্মুখে আছে যেন ছাগল, আমি ছাগলকে দেখছি, কিন্তু পাই নাই। কেন পাই নাই? কারণ, আমার দেখা বিক্ষিপ্তভাবে; যতই একাগ্র হ'ইব, ততই লক্ষ্যের সম্মুখ হ'তে অন্য বস্তু সরিয়া যাইবে। একাগ্রতার পূর্ণতাই নিরোধ—তখন লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘট্‌বে, ব্যবধান কেটে যাবে। আমি ছাগল হ'য়ে যাব। মনে কর—আপাততঃ আমি ছাগল দেখ্‌ছি—আছি আমি দূরে। দূরে থাকিলেও লক্ষ্য স্থির থাকিলে যোগসূত্র থাকিলই। এই যোগসূত্রটি যতই গুটাইয়া লওয়া যায়, ততই একাগ্রতা বাড়ে, লক্ষ্য নিকটবর্তী হয়, পরিশেষে প্রাপ্তি বা সমাধিতে তাদাত্ম্য হয়। তখন, আমিই ছাগল—ইহা বুঝা যায়, অথচ আমি যে ছাগলের অতীতও রহিয়াছি—সঙ্গে সঙ্গে তাহাও জানা যায়। ইহার পরাবস্থায় শুধুই "অতীত" ভাব—নির্বিকল্প ভাব। এই নির্বিকল্প বিশুদ্ধ নির্বিকল্প নহে। কারণ, ইহা হইতে ঐ ছাগল-রূপ বিকল্প—"আমি ছাগল" এইটি—উদিত হয়। পরে আমি ও ছাগলের মধ্যস্থ অস্পষ্ট যোগসূত্রটি ছড়াইতে থাকে, ক্রমশঃ আমি হ'তে ছাগল পৃথক্ হয়, আমি জ্ঞাতা হইতেই ছাগল জ্ঞেয় হইয়া আলাদা হইয়া পড়ে। অতএব সৃষ্টিতে—

চিত্ত | ইচ্ছা-নিরোধ ১ম = নির্বিকল্প (আমি মগ্ন ও ছাগল মগ্ন)
| জ্ঞান একাগ্র ২য় = সবিকল্প (ছাগল স্পষ্ট as "আমি ছাগল")
| ক্রিয়া বিক্ষিপ্ত ৩য় = স্থূল (আমি হ'তে ছাগল পৃথক)
ইহার অতীত যাহা, তাহাই আত্মা।

১১/৫/৩৪

(১)

যাহা বিভু ও ব্যাপক, তাহা ব্যাপ্যকে স্পর্শ করে না—তাহা নিরঞ্জন। ব্যাপ্যের অতীত না হ'লে ব্যাপ্যকে ব্যেপে থাক্‌তে পারে না। ব্যাপ্যের সঙ্গে সর্বাত্মনা এক হওয়াই ব্যাপ্তি—অবশ্য তার অতীত হ'য়ে। যাহা অতীত, তাহাই যখন ব্যাপক, তখন উহা এক ও অখণ্ড। ইহাই যথার্থ বিন্দু বা আকাশ। point. ইহা সর্বত্র আছে, অথচ কিছুকে ছুঁইছে না—আবার এমনভাবে যে, সর্বাত্মনা তাহাই হ'ইয়া আছে। ইহার আর একটা দিক্ আছে,—সেটার তরঙ্গ হয়; সেটা স্কন্ধ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে—যেমন আলো। ইহা ঠিক ব্যাপক নহে—অংশতঃ। এই ঘরে আলো ছড়ান আছে—এই আলোর মাঝে মাঝে আঁধার আছে। তাই এ আলো কম-বেশী হ'তে পারে। যদি আলো ঠিক ব্যাপক হ'ত, তা হ'লে তাহা কাউকে স্পর্শ করত না। অথচ সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে থাক্‌ত। জ্ঞানে ও চৈতন্যে এই ভেদ। জ্ঞানে অ-জ্ঞান মেশানো থাকে—তাই অজ্ঞানে জ্ঞান ছড়ায়, জ্ঞান অ-জ্ঞানকে স্পর্শ করে। তাই জ্ঞানের ব্যাপ্তি আংশিক। পূর্ণ ব্যাপ্তি হ'লে উহা অ-জ্ঞানকে স্পর্শ করত না। অ-জ্ঞানের দরুণ উহার ন্যূনতা বা আধিক্য হ'ত না। তেমনি যে কৃপা ব্যাপক তাহা শুদ্ধ, অমিশ্র—সর্বত্র আছে; অথচ না থাকার মতন। পাপ-পুণ্যের সর্বত্রই তাহা আছে, অথচ অস্পর্শ-যোগে। পাপাদির দ্বারা তাতে ন্যূনতাদি হয় না। কর্মাপেক্ষ কৃপা তদ্রূপ নহে।

(২)

ক, খ, প্রভৃতির সমষ্টি অ, অথচ সমষ্টি হইতেও অধিক। পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে যে, সর্বাতীত হ'লেই স্বতঃই সর্বাত্মক হওয়া যায়, এখানে তেমনি বলা হ'চ্ছে যে, সর্বাত্মক হ'লে তখনি সর্বাতীত হওয়া যায়। অতএব ক, খ, গ, প্রভৃতি সবগুলি একত্র হইবামাত্র একটি তদতীত অখণ্ড সত্তা আবির্ভূত হয়, তাই অ। তাই অ ক, খ, ইত্যাদির সমষ্টিও বটে, তদতীতও বটে। একাধারে শক্তি ও শিব। কেন্দ্র হ'তে সব রেখা বার হ'য়েছে, সবগুলি কেন্দ্রে এক। অথচ এক হ'লেও তাতে বহু এক হইয়া আছে।

এই অ=সমষ্টি জীব, অথচ জীবাতীত বা ঈশ্বর।

ক, খ প্রভৃতি=ব্যষ্টি জীব।

সমষ্টি-জীব যাহা দেখে, ব্যষ্টি-জীবের পক্ষে তাহাই ভোগ্য-সৃষ্টি। একের দৃষ্টিই অপরের পক্ষে সৃষ্টি। ব্যষ্টি-জীবের দৃষ্টি পরবর্তী। সমষ্টি যাহা দেখে না, ব্যষ্টির কাছে তার সত্তা নাই—সুতরাং তা ভোগ্য হয় না।

আর এক কথা। সমষ্টির দৃষ্টি সকল ব্যষ্টি-জীবের পক্ষে common সৃষ্টি। কারণ, centre-এর সঙ্গে সব radius-ই যুক্ত আছে। ব্যষ্টি কেন্দ্রস্থ নহে বলিয়া তাহার যাহা দৃষ্টি, তাহা শুধু তাহারই; সকলের নহে। ব্যাবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তার ইহাই ভেদ। ব্যষ্টি দেখে ব্যষ্টি-কর্মের ফলে, সমষ্টি দেখে সমষ্টি-কর্মের ফলে। সমষ্টি-কর্ম ভিন্ন ব্যাবহারিক সৃষ্টি হয় না। ব্যষ্টি-কর্ম হ'তে প্রাতিভাসিক সৃষ্টি মাত্র হয়।

যে সমষ্টি-জীব, সে-ই পক্ষান্তরে ঈশ্বর।

প্রথম পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা পরতন্ত্র, দ্বিতীয় পক্ষে স্বতন্ত্র। আসল কথা,—জীবভাবের সূচনার পূর্ব হইতেই ইচ্ছা জাগিয়া আছে। সমষ্টি-জীবে ইহা পরতন্ত্র, ব্যষ্টি-জীবেও পরতন্ত্র।

১২/৬/৩৫

বাচ্য → বাচক → বাচকাভাস।

সর্বান্তর বাচ্য। তাকে ঘেরিয়া আছে বাচক। বাচকের আভাস বাহ্য।

বস্তুর আভাটিই শব্দ বা জ্যোতিরূপে ছড়াইয়া আছে। এই শব্দ বা জ্যোতিকে প্রত্যাহৃত বা ভিতরে ঢুকাইলেই বস্তুতে প্রবেশলাভ হয়—সাক্ষাৎকার হয়। শব্দ বা জ্যোতির ভিতরে ঢুকাও যা, মনের ভিতরে ঢুকাও তা-ই। সুতরাং যখন শব্দ বন্ধ হয়—অর্থাৎ শুনা যায় না—, যখন জ্যোতি বিলীন হয়—অর্থাৎ কিছু দেখা যায় না,—তখন মনও লীন হইয়া যায়—তখনই সাক্ষাৎকার। যে উপাদানে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মনও জন্মে। তবে শব্দ বা জ্যোতি প্রকৃতি, মন পুরুষ। যতদূর শব্দ, ততদূর মন, যতদূর মন ততদূর শব্দ। যে বস্তু হইতে আভারূপে শব্দ বা জ্যোতির বিকাশ, তাহা হইতেই সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ। পুরুষ প্রকৃতিকে চায়, পাইলেই দুই মিলিত হয় —তখন ভিতরে, বস্তুতে, অদ্বৈতে প্রবেশ হয়। মন শব্দ বা জোতিকে পাওয়ার জন্যই চঞ্চল। পাইলেই মন তার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন মন স্থির হয় অর্থাৎ মন থাকে না, শব্দও শান্ত হয়, জ্যোতিও নিভিয়া যায়। এই যে শব্দ বা জ্যোতি বলিলাম—ইহাও উপলক্ষণ—রূপ, রস প্রভৃতি সবই বুঝিতে হইবে। অতএব মন রূপ-রসাদিকে প্রাপ্ত হইলেই লীন হইয়া যায়। তখন মনও থাকে

না, রূপ-রস-শব্দাদিও থাকে না—পুরুষ ও প্রকৃতি মিশিয়া যায়। বস্তু প্রকাশিত হয়। ইহাই প্রত্যক্ষ।

মহাশক্তির ঢাকনা খুলিয়া যায়।

আমরা জগতে যে শব্দ জ্যোতি (রূপ) প্রভৃতি আনি, তাহা আভাসমাত্র—খাঁটি নহে। খাঁটি হইলে মন তাহা পাইয়া শান্ত হইত—বস্তুর প্রত্যক্ষ হইত। এই আভাসের অন্তরালে খাঁটি শব্দ আছে, খাঁটি জ্যোতি বা রূপ আছে, খাঁটি রস আছে, ইত্যাদি।

বস্তুর আভাটিই রূপ-রস শব্দ ইত্যাদি এক পক্ষে, অপর পক্ষে মন। এই আভা ধরিয়াই বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ মনের সঙ্গে এই আভাটির যোগ হইলেই বস্তুর উদয় হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় আভা নাই, মনও নাই; আছে আভাসমাত্র। এই আভাস কাটিয়া গেলে যে অবস্থা হয় তাহাকেই মনের শুদ্ধি বলে; রূপ-শব্দ প্রভৃতিরও শুদ্ধি বলে। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি হয়।

একটি হইলেই অপরটি অবশ্যই হইবে। তখন শুদ্ধ চিত্ত ও ভূত মিলিত হইয়া বস্তুর—চৈতন্যের, আত্মার—দ্রব্যের—প্রকাশ করে।

নামাভাস হইতে নাম, পরে রূপ বা স্বরূপ।

সর্বত্রই এইরূপ।

শুদ্ধ শব্দাদির দুইটি করিয়া অবস্থা—একটি সামান্য ও অপরটি বিশেষ।

মন সাকার ও নিরাকার, শব্দাদিও সামান্য ও বিশেষ।
(yoga) সাকার মন + সামান্য শব্দ = বিশেষ সৃষ্টি
(vijnana) নিরাকার মন + বিশেষ শব্দ = বিশেষ সৃষ্টি

যেমন একটি মূল সাম্যভাবাপন্ন বর্ণ আছে—সামান্য বর্ণ। আবার তার বিশেষ আছে। তেমনি একটি সামান্য শব্দ আছে—আবার তারই নানা ভেদ আছে। এই বিশিষ্ট শব্দগুলিকে চিনিতে হয়। চিনিয়া তাদের মিলন করাইতে পারিলেই সামান্যতঃ মনের সংযোগমাত্রই বস্তু নির্মাণ হইবে। মিলনের প্রকার-ভেদ হইতে বস্তুর ভেদ। মূলে একই শব্দ—তাহার সঙ্গে শুদ্ধ মনের সংযোগ হইলেই পরম বস্তুর প্রকাশ অবশ্য হইবে।

রশ্মি-বিজ্ঞানও তদ্রূপ। বিশিষ্ট রশ্মি মিলিত হ'লে ও সামান্যতঃ মন তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে তত্তদ্ বস্তুর সৃষ্টি। মূল সাদা রশ্মির সঙ্গে সামান্য মনের যোগে পরমপদার্থের আবির্ভাব।

অন্যত্রও তদ্রূপ।

এক পথে জগতের নির্মাণ, অন্য পথে ব্রহ্মস্ফূর্তি। উভয়ত্র পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন আবশ্যক।

১০/১২/৩৫

জ্ঞান ভিন্ন প্রাপ্তি—অভেদ হ'তে পারে না। জ্ঞান = দেখা। দেখ্তে দেখতেই এক হ'য়ে যায়। যা দেখা যায়, দ্রষ্টাতে তার অংশ আসে—দ্রষ্টার অংশ তাতে যায়। ফলে দুই সমান হয়। বস্তুর একদেশ ভিন্ন একটি angle-এ দেখা যায়। (জ্ঞান ও ক্রিয়ার মূল = গতি। জ্ঞান = annual motion. ক্রিয়া = daily motion. মূলে motion একই।) বিক্ষিপ্ত দৃষ্টির দেখা ঠিক দেখা নহে। দৃষ্টি একাগ্র হ'লে ও সেই একাগ্র দৃষ্টি বস্তুর চারিদিকে ৩৬০° পড়িলে বস্তুর বহিরঙ্গ সাক্ষাৎকৃত হয়। "আমি" দ্রষ্টাতে থাকে, তাই দৃশ্য হ'তে দ্রষ্টা প্রবল। ক্রমশঃ দ্রষ্টা দৃশ্যাত্মক হয়—অথচ দ্রষ্টা থাকে। চারিদিক্ জিত—দিগ্বিজয়—হইলে ঊর্ধ্ব অধঃ জয় করতে হয়। অর্থাৎ চারিদিক্ ক্রমশঃ জিত হইলে বৃত্তটি—বহিরঙ্গটি একটি রেখাতে পরিণত হয়—বৃত্তভাব থাকে না বলিয়া একটি সরলরেখা হয়, যাহার দুই প্রান্ত দুই মেরু—বিসর্গ—দুই বিন্দু—উত্তর ও দক্ষিণ—ঊর্ধ্ব ও অধঃ। এই দুইটি জিত হইলে অন্তঃপ্রবেশ হয়, তখন আর বাহিরের কিছু থাকে না। কেন্দ্রে স্থিতি হয়। তখন ঐ বস্তু যে আমি তাহা বোধে আসে। ইহাই জ্ঞানের ফল।

চতুরাম্নায়—ষড়াম্নায়—প্রভৃতির ইহাই অর্থ।

যখন কোন বস্তুকে দেখি, তখন ঠিক তাকে দেখি না; তার বিকীর্ণ রশ্মি-গুলি দেখি। ধর—যেন বৃত্তাকারে ৩৬০° রশ্মি ক্রমশঃ পর পর দেখিতে হইবে। তবে ত' সবটি দেখা হবে। আমাদের দৃষ্টির রশ্মি ছড়ান—একটি রশ্মিতে এগুলিকে আন্‌তে হবে। নতুবা এক একটি রশ্মি দেখিতে পাওয়া যাবে না। ভিতরেও ৩৬০° রশ্মি ফেরা আবশ্যক।

প্রত্যেকটি বস্তুই কিরণ-জালের দ্বারা আবৃত। এগুলি বর্ণমালা। এগুলি সমষ্টি করিলে আবরণ (যোগমায়া) কেটে যায়—কেন্দ্রে প্রবেশ হয়। ইহাই ষট্-চক্রভেদ—সহস্রারের কর্ণিকাতে প্রবেশ।

৩০/১২/৩৫

পরমপদ কল্পনাহীন, কিন্তু সেখান হ'তে নিরন্তর কল্পনা উঠ্ছে, বিকল্প উঠছে, ইচ্ছা উঠছে। উঠেই নেমে পড়ছে; কারণ, সেখানে থাকবার উপায় নাই। ইহাই অনিচ্ছার ইচ্ছা—নির্বিকল্পের কল্পনা, নিষ্কামের কাম, বিক্ষেপ।

যে নীচে হ'তে সেটাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করছে—সে তাতে মুগ্ধ হচ্ছে। আবরণ।

যে খেলা দেখাচ্ছে—অর্থাৎ যেখান থেকে খেলা চল্‌ছে, সে আত্মবিস্মৃত না হ'লে, না নামলে, খেলা দেখতে পায় না।

আর একটি কথা—গুহ্য। পূর্বে বলিলাম—কল্পনা হচ্ছে, স্বভাবতঃ। সেখানে অহং লাগাইলে বুঝা যায় সে কল্পনা করছে। অর্থাৎ দীপ হ'তে প্রভা বাহির হচ্ছে। প্রভার একটা ব্যাপক সত্তা আছে, একটা রেখা আছে, একটা অণু-পুঞ্জের দিক্ আছে।

৩০/১২/৩৫

পরমপদ হ'তে সব স্ফুরণ হ'চ্ছে—স্বভাবতঃই হচ্ছে। এই স্বভাব = স্বাতন্ত্র্য। ইহার বিরাম নাই। তবে এক দিক্ দিয়া বাহির হচ্ছে, আর এক দিক্ দিয়া ঢুকছে। নিরন্তর চল্‌ছে। পরমপদ তার দ্রষ্টা। তাঁতে ইচ্ছা নাই। [দ্রষ্টার দিক্ = চিৎ; স্ফুরণের দিক্ = আনন্দ। এই চিদানন্দময় আবর্তনই নিত্যলীলা—ইচ্ছা বা কামের ঊর্ধ্বে।]

যা বের হচ্ছে তা দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে যাচ্ছে—একদিকে ইচ্ছা—জ্ঞান—ক্রিয়ারূপ শব্দ, অপরদিকে অর্থ; একদিকে প্রকৃতি, অপরদিকে পুরুষ।

ইচ্ছা হ'তে ক্রিয়া—ইহাই শব্দের বিকাশ। অর্থের বিকাশ।

[ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া]	ইচ্ছাকালে অর্থ ব্যক্ত্যুন্মুখ
	জ্ঞানকালে " অর্ধব্যক্ত
	ক্রিয়াকালে " ব্যক্ত

অর্থাৎ শক্তি যখন ইচ্ছা, শক্তিমান্ তখন ব্যক্ত্যুন্মুখ।
" " জ্ঞান, " " অর্ধব্যক্ত।
" " ক্রিয়া, " " ব্যক্ত।

চিৎ ও আনন্দের আবর্ত = নিত্যলীলা।

ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আবর্ত = সংসার।

ইচ্ছা হ'তেই সৃষ্টি। ক্রিয়াতে তার পূর্ণতা। ক্রিয়াতে আসার সময় ক্রম ধরা পড়ে না। ফিরিবার সময় ক্রিয়া হ'তে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে ইচ্ছা। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে।

ব্যষ্টিভাবে ইচ্ছার লয় হ'লে সমষ্টি-ইচ্ছার অধীন থাকিতে হয়। সমষ্টি-ইচ্ছার লয় হ'লে প্রলয় হয়। মহাসমষ্টি-ইচ্ছার লয় হ'লে মহাপ্রলয় হয়। তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ হয়।

এইরূপে নিত্যধাম হ'তে এক একটি ইচ্ছার উদয় হচ্ছে, আবার লয় হচ্ছে। ইচ্ছার স্থিতিকালই সংসার। ইহাই কল্পকাল—কল্পনা।

৬/১/৩৬

মনোহর = যে মনকে হরণ করে। বিষয়ের বল যখন মনের বল অপেক্ষা অধিক—ফলতঃ যখন বিষয় মনকে আকর্ষণ করে, মন বিষয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না, তখনই বিষয়কে মনোহর বলা চলে।

আসল কথা এই—

মনের একটি ধারা আছে। মন কিছু না কিছু আত্মশক্তি ধারণ করেই। তাই মনের স্বাভাবিক গতি আত্মার দিকে। তবে যে যেতে পারে না, তাহার কারণ—বিষয় কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি।

পক্ষান্তরে, বিষয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতির দিকে। কার্যমাত্রই, বিকার-মাত্রই, আপন কারণে যাইয়া বিশ্রাম করিতে চায়। কিন্তু পুরুষসম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে না হ'লে কার্য হয় না। তাই কার্যের মধ্যে অস্ফুটরূপে পুরুষের স্পর্শ আছে। তবে তাহা কার্য করিতে পারে না। না পারিলেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রভাব আছেই। ফলতঃ বিষয়ও একেবারে মূলাপ্রকৃতিতে সহসা ফিরিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহাতে চিত্তসম্বন্ধ—আত্মসম্বন্ধ—রহিয়াছে—তাহাও এক কারণ।

যখন মন বিষয়েতে যুক্ত হয়, তখন যদি মনে আত্মবল কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত থাকে, তাহা হ'লে বিষয় মনকে টানিতে পারে না, মনই বিষয়কে টানিয়া লয়। বিষয়কে লইয়াই মন আত্মায় অবগাহন করে। মন বিষয়কে হজম করিয়া স্বয়ং তাহার আকার ধারণ করে। ইহাকে সাকার জ্ঞান বলে। বিষয়ের আকারটি মাত্র থাকে—উপাদান শুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা। তাহার ফলে মন ও বিষয় উভয়ই তখন চিন্ময় হইয়া যায়। পরে যখন বাহির হইয়া আসে, তখন মনও চিন্ময়, বিষয়ও চিন্ময়। তখন বিষয়ের মুক্তি হইয়া গিয়াছে। বিষয় তখন ব্রহ্ম হইয়াছে। এই প্রকারে যাবতীয় বিষয়কে মুক্তি দিতে পারিলে সকল জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। তখন বৈরাগ্য সিদ্ধ হবে —কোন বিষয়ের আকর্ষণ থাকিবে না। তখন সমগ্র মনই চিন্ময় হইয়া যাইবে —অর্থাৎ মনে চিজ্জ্যোতি সর্বদা থাকিবে।

ইহার পর মূলপ্রকৃতির চৈতন্য হ'লে ব্রহ্মময় মন ও ব্রহ্মময় জগৎ তাহাতেই লয় পায়। শুধু এক চৈতন্য-সত্তাই থাকে। তাহা স্বপ্রকাশ। সেখানে আর মন নাই। সবই আত্মার শক্তিমাত্র এবং শক্তি অন্তর্লীন।

অন্যপক্ষে যদি মনকে বিষয়ে টানিয়া লয়, তাহা হইলে ফল ভিন্ন হয়। কিছুকাল টানিতে থাকিলে সমস্ত মনটি বিষয়ে ডুবিয়া যায়—মনের জ্ঞানভাব

বিষয়ে লীন হইয়া যায়। ফলে বিষয়ই থাকে, মন তাহার সঙ্গে একাকার হয়, জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। মনের প্রায় সমস্তটা যদি জড়ত্ব লাভ করে, তাহা হইলে আত্মা অপ্রকাশ হইয়া পড়িবে—অ-জ্ঞানে মগ্ন হইবে।

আত্মা জড়। অনাত্মা
/ /
মন ———বিষয়

মন যদি বিষয়কে টানিয়া লয়, তাহা হইলে আত্মা জ্ঞানময় হয়। অনাত্মা দুর্বল হয়। বিষয় যদি মনকে টানিয়া লয়, তাহা হইলে আত্মা জ্ঞানহীন হয়। অনাত্মা বা জড়ভাব প্রবল হয়। স্ব-প্রকাশ ভাব থাকে না।

১৬/১/৩৬

কোন খাদ্যদ্রব্য খাইলে যদি হজম না হয়, তাহা হইলে পেটে বায়ু হয়, gas হয় ; হজম হ'লে (ব্যাধি) হয় না। খাদ্যদ্রব্যের সূক্ষ্মাংশই বায়ু—তাহা শরীরের সঙ্গে এক হয় না। ইহাই শরীরকে চালায়।

তদ্বৎ বাহ্য জগতের কোন ভোগ্যবস্তু হজম না হ'লে (আধি) ভিতরে বায়ু জন্মায়। এই বায়ুই বাসনাখ্য সংস্কার। ইহাই মনকে চালায়। চঞ্চল করে।

(ক) ভোগ না থাকিলে বায়ুর কোন ভয় নাই। যে শুদ্ধ দ্রষ্টা, উদাসীন, তাহার বায়ু হয় না। সে স্থির। পক্ষান্তরে যাহার বায়ু হয় না, সে-ই দ্রষ্টা, সাক্ষী। বায়ু হ'লেই ভোক্তা হয়—সংস্কারাদিও জন্মে।

(খ) ভোগ থাকিলেও যদি হজম হয়, তা হ'লে বায়ুর ভয় নাই। হজম হওয়া মানে কি?

বাহ্যদ্রব্যের এক অংশ স্থূল শরীরকে পুষ্ট করে—যদি হজম হয়।

বাহ্যদ্রব্যের সূক্ষ্ম অংশ চিত্তকে পুষ্ট করে—ইহা চিত্তরূপে পরিণত হয়।

যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বায়ু জন্মে—ইহাই সংস্কার। অতএব সংস্কার চিত্ত ও ভূতের মধ্যাবস্থা। ভূতের মন্থন হ'তে যে সারাংশ আলাদা হয়, তাহা চিত্তে যায়—অ-সারাংশ সংস্কাররূপে লাগিয়া থাকে ও চিত্তকে চালনা করে।

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকাঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন
১২। বিজিজ্ঞাসা